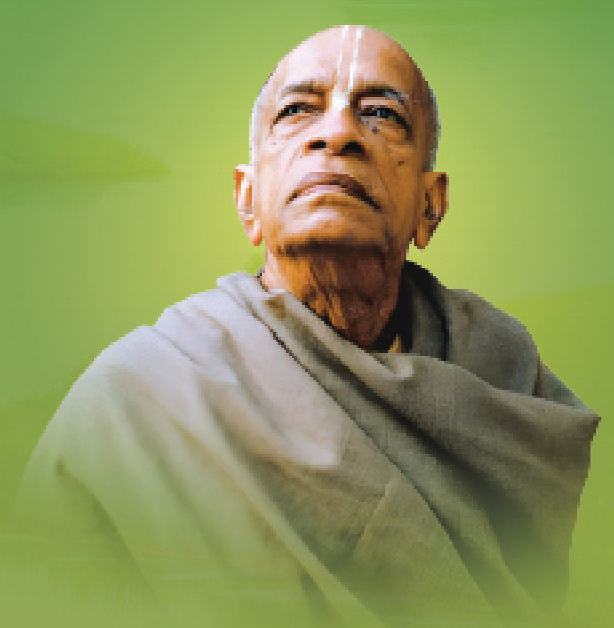

এই শিশুরা হচ্ছে আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ আশা, তাই এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে কিভাবে আমরা তাদেরকে খুব ছোটবেলা থেকেই কৃষ্ণভাবনায় প্রশিক্ষিত করছি।

-শ্রীল প্রভুপাদ
(সৎ স্বরূপকে পত্র ১১ এপ্রিল ১৯৭৩)

ISKCON BANGLADESH | JAGRATA CHATRA SAMAJ ISKCON, BANGLADESH

পরিচালনায়ঃ জাগ্রত ছাত্র সমাজ

আয়োজনেঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন), বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যঃ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

officialjcsbd | iskconjcsbd@gmail.com | jcsdhaka | www.jcsdhaka.com

ISKCON®
MINISTRY OF EDUCATION

JAGRATA CHATRA SAMAJ
ISKCON, BANGLADESH

ইস্‌কন প্রতিষ্ঠার ৬০ বছর পূর্তিতে
ভক্তিবেদান্ত মেগা কনটেস্ট-২০২৬

খ-বিভাগ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)

জাগ্রত ছাত্র সমাজ

স্বামীবাগ আশ্রম, ৭৯ স্বামীবাগ রোড, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪।

HOTLINE +880 1323-997755

উৎসর্গ

ইস্‌কন প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য:
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এর করকমলে

ইস্‌কন প্রতিষ্ঠার ৬০ বছর পূর্তিতে

ভক্তিবেদান্ত মেগা কনটেস্ট-২০২৬

উপদেষ্টা মণ্ডলী:

শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ
শ্রীমৎ ভক্তি অদ্বৈত নবদ্বীপ স্বামী মহারাজ
শ্রীমৎ ভক্তি বিনয় স্বামী মহারাজ
শ্রীমৎ ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজ
শ্রীমৎ ভক্তিময় নিতাই স্বামী মহারাজ
শ্রী নাড়ু গোপাল দাস
শ্রী হংস কৃষ্ণ দাস

সমন্বয়কবৃন্দ:

শ্রী জগৎগুরু গৌরাঙ্গ দাস
শ্রী শুভ নিতাই দাস
শ্রী দ্বিজমনি গৌরাঙ্গ দাস

শুভেচ্ছা বাণী

ইস্‌কন প্রতিষ্ঠার ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে 'জাগ্রত ছাত্র সমাজ' - এর পরিচালনায় ইস্‌কন বাংলাদেশ স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করেছে দেশব্যাপী সর্ববৃহৎ পারমার্থিক প্রতিযোগিতা **'ভক্তিবেদান্ত মেগা কনটেস্ট-২০২৬'**। ছাত্র-ছাত্রীদের বৈচিত্র্যময় এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। এর মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চেতনাও বিকশিত হবে। পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিনিধিসহ সবাইকে এই উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে সাফল্যমণ্ডিত করার আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী

জিবিসি-ইস্‌কন ও নির্দেশক -জাগ্রত ছাত্র সমাজ।

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি

- প্রথমে উপজেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।
- উপজেলা থেকে জেলা তারপর বিভাগীয়/আঞ্চলিক পর্ব শেষে জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।
- প্রত্যেকের জন্য কুইজ বাধ্যতামূলক। কুইজ ছাড়াও সর্বোচ্চ ৩টি বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত (ইয়েস কার্ড প্রাপ্ত) প্রতিযোগীরা বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত প্রতিযোগীরা জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- সকল প্রতিযোগীদের অবশ্যই স্ব-স্ব স্কুল ড্রেস পরিধান করে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
- আগ্রহী প্রতিযোগীদের নিকটস্থ ইস্‌কন মন্দির, প্রচার কেন্দ্র ও নামহট্টে যোগাযোগ করে রেজিস্ট্রেশনপূর্বক প্রতিযোগিতার সিলেবাস ও কুইজ বই সংগ্রহ করতে হবে।
- অনলাইনে (গুগল ফরম) ও ওয়েবসাইট www.jcsdhaka.com - এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।
- রেজিস্ট্রেশনকৃত প্রতিযোগীগণ স্ব স্ব স্থানীয় কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- গুগল ফরম লিংকটি জাগ্রত ছাত্র সমাজের Facebook Page অথবা QR কোড এ পাওয়া যাবে।
- সর্বদা বিচারকদের/কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী
সকলকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

প্রত্যেক পর্বেই থাকবে উপহার
সামগ্রী, ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ইত্যাদি।

চূড়ান্ত পর্বে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান
অধিকারীর জন্য থাকবে শিক্ষাবৃত্তি।

প্রতি গ্রুপে সেরা ১০ জন প্রতিযোগী পাবে
বিশেষ পুরস্কার।

গীতার শ্লোক আবৃত্তি, ভজন-কীর্তন ও অন্যান্য বিষয়ে প্রতিযোগীরা WhatsApp, Facebook, YouTube এর মাধ্যমে অডিও, ভিডিও এবং লিংক সংগ্রহ করে প্রস্তুতি নিতে পারবে।

রেজিস্ট্রেশন ফি ৳১০০

প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ

গীতার শ্লোক আবৃত্তি

উপস্থাপনের নিয়মঃ

শুরুতে **'হরেকৃষ্ণ'** সম্বোধনপূর্বক **'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'** বলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা.......অধ্যায়.......শ্লোক সংখ্যা উল্লেখপূর্বক মুখস্থ শ্লোকটি উচ্চারণ করে অনুবাদ বলতে হবে।

খ বিভাগ-১৫টি শ্লোক **২/২০, ৪/৩৯, ৬/৪৭, ৭/১৫, ৮/৯, ৯/৩৪, ১০/১২, ১১/১৬, ১১/১৮, ১২/২, ১৩/২৩, ১৫/১৫, ১৬/২৪, ১৭/২০, ১৮/৬৫**

উপজেলা পর্যায়	৪টি শ্লোক
জেলা পর্যায়	৬টি শ্লোক
বিভাগীয় পর্যায়	৮টি শ্লোক
চূড়ান্ত পর্যায়	১২টি শ্লোক

অংশগ্রহণকারীকে নির্বাচিত শ্লোকগুলোর মধ্যে অনুষ্টুপ (২ লাইন) ও ত্রিষ্টুপ (৪ লাইন) ছন্দে প্রস্তুতি গ্রহণ করে আবৃত্তি করতে হবে।

নির্বাচিত গীতার শ্লোকসমূহ

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ।। ২/২০ ।।

অনুবাদঃ আত্মার কখনও জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না, আত্মার কদাচিৎ উৎপত্তি হয়নি, হচ্ছে না, আর হবেও না। আত্মা জন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য এবং পুরাতন হলেও চির নবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ।। ৪/৩৯।।

অনুবাদঃ সংযতেন্দ্রিয় ও চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞান লাভে তৎপর শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করেন। সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরাশান্তি প্রাপ্ত হন।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ।। ৬/৪৭ ।।

অনুবাদঃ যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদগতচিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেটিই আমার অভিমত।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ।। ৭/১৫ ।।

অনুবাদঃ মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিকভাবসম্পন্ন, সেই ধরণের দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।।৮/৯।।

অনুবাদ: সর্বজ্ঞ, সনাতন, নিয়ন্তা, অণু থেকে সূক্ষ্মতর, সকলের বিধাতা, জড় বুদ্ধির অতীত, অচিন্ত্য ও পুরুষরূপে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করা উচিত। তিনি সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় এবং তমসাচ্ছন্ন জড়া প্রকৃতির অতীত।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।। ৯/২২ ।।

অনুবাদঃ অনন্যচিত্তে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে পরিপূর্ণ ভক্তি সহকারে যাঁরা সর্বদাই আমার উপাসনা করেন, তাঁদের সমস্ত অপ্রাপ্ত বস্তু আমি বহন করে আনি এবং তাঁদের প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করি।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ।। ৯/৩৪ ।।

অনুবাদঃ তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে প্রণাম কর। এভাবে আমাতে উৎসর্গীকৃত হয়ে সম্পূর্ণরূপে আমাতে অভিনিবিষ্ট হলে নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে লাভ করবে।

অর্জুন উবাচ
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ।। ১০/১২ ।।

অনুবাদঃ অর্জুন বললেন– তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র ও পরম পুরুষ। তুমি নিত্য, দিব্য, আদি দেব, অজ ও বিভু।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।।১১/১৬।।

অনুবাদঃ হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, তোমার সর্বত্র ব্যাপ্ত অনন্ত রূপে বাহু, উদর, মুখ এবং নেত্রসমূহ দেখছি। আমি তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ।। ১১/১৮ ।।

অনুবাদঃ তুমি পরম ব্রহ্ম এবং একমাত্র জ্ঞাতব্য। তুমি সমগ্র বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমি অব্যয়, সনাতন ধর্মের রক্ষক এবং সনাতন পরম পুরুষ। এটিই আমার অভিমত।

শ্রীভগবানুবাচ
ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ।। ১২/২ ।।

অনুবাদঃ শ্রীভগবান বললেন– যাঁরা তাঁদের মনকে আমার সবিশেষ রূপে নিবিষ্ট করেন এবং অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ।।১৩/ ২৩ ।।

অনুবাদঃ এই দেহে আরও একজন পরম পুরুষ রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর; তাঁকে পরমাত্মাও বলা হয়।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ।। ১৫/১৫ ।।

অনুবাদঃ আমি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি হয়। আমিই সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য এবং আমিই বেদান্তকর্তা ও বেদজ্ঞ।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি।।১৬/২৪।।

অনুবাদ: অতএব, কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। শাস্ত্রীয় বিধানে কথিত কর্ম সম্বন্ধে জেনে তুমি সেই কর্ম সম্পাদন করতে যোগ্য হও।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।।১৭/২০।।

অনুবাদ: দান করা কর্তব্য বলে মনে করে এবং প্রত্যুপকারের আশা না করে উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত পাত্রে যে দান করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক দান বলে গণ্য করা হয়।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।।১৮/৬৫।।

অনুবাদঃ তুমি সর্বদা আমার স্মরণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তা হলে তুমি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। এই বিষয়ে আমি তোমার কাছে সত্যই প্রতিজ্ঞা করছি, যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

ভজন-কীর্তন

প্রতিযোগীদের নামহট্ট পরিচয় ও ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন গ্রন্থ থেকে ভজন-কীর্তনের প্রস্তুতি নিতে হবে

উপজেলা পর্যায়	৩টি
জেলা পর্যায়	৪টি
বিভাগীয় পর্যায়	৬টি
চূড়ান্ত পর্যায়	৮টি

চিত্রাঙ্কন

বিষয়: শ্রীকৃষ্ণ, রাধা-কৃষ্ণ, গৌর-নিতাই, জগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা দেবীর মুখমণ্ডলের পূর্ণ ছবি/ বিভিন্ন লীলার ছবি।

- সরবরাহকৃত কাগজে ছবি এঁকে রং করতে হবে।
- প্রতিযোগীদের বোর্ড নিয়ে আসতে হবে।
- রং তুলিসহ রং করার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে আসতে হবে।

বৈদিক নৃত্য

- শাস্ত্রীয় নৃত্য কত্থক/ভরতনাট্যম/ ওডিসি/ মনিপুরি।
- সৃজনশীল নৃত্য: ভজন ও ভক্তিগীতি।
- গানের সময় অনধিক ৩ মিনিট।
- প্রতিযোগীকে নিজ ফোনে গান ডাউনলোড করে আনতে হবে।
- হিন্দি গান, সিনেমার গান এবং মিক্সিং গান অবশ্যই বর্জনীয়।

কুইজ

- বিভাগ ভিত্তিক নির্ধারিত বইয়ের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রস্তুতি নিতে হবে।
- বিষয়সমূহ: মন্ত্র ও শ্লোকাবলি, প্রশ্নোত্তর, সদাচার, প্রবন্ধ ইত্যাদি।
- উপজেলা পর্যায়ে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক (MCQ) পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে।
- পরবর্তী পর্যায়ে নৈর্ব্যক্তিক (MCQ) ও রচনামূলক পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে।
- পরীক্ষা মোট ১০০ নম্বরে হবে।
- উপজেলা পর্যায়ে ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কাটা যাবে না।
- জেলা পর্যায়ে প্রতি ৫টি ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা যাবে।
- বিভাগীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতি ৪টি ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা যাবে।

কুইজ

বৈদিক মন্ত্র ও শ্লোকাবলী

গুরু প্রণাম মন্ত্র:	ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।
শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্র:	হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে। গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে ।।
নিদ্রা জাগরণের পর প্রণাম মন্ত্র:	প্রাতঃ প্রবোধিতো বিষ্ণো হৃষীকেশেন যৎ ত্বয়া। যদযৎ কারয়শীসান তৎ করোমি তবাজ্ঞায়া ।।
জল শুদ্ধি মন্ত্র:	গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী । নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।
সূর্য প্রণাম মন্ত্র:	ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধান্তারীং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ।।
চরণামৃত গ্রহণের মন্ত্র:	অকালমৃত্যু হরণং সর্বব্যাধি বিনাশনং। বিষ্ণোপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম।।
শুচিতার মন্ত্র:	ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুন্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।।
পাঠ শুরু করার পূর্বে:	নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।
জন্ম–সংবাদে:	ওঁ আয়ুষ্মান ভব (ছেলের ক্ষেত্রে) ওঁ আয়ুষ্মতী ভবঃ (মেয়ের ক্ষেত্রে)
মৃত্যু–সংবাদে:	ওঁ দিব্যান লোকান্ স গচ্ছতু (স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে– সা গচ্ছতু)

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দ গোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।। (ভাগবত–১/৮/২১)

অনুবাদ: বসুদেব তনয়, দেবকীনন্দন, গোপরাজ নন্দের পুত্র এবং গাভী ও ইন্দ্রিয়সমূহের আনন্দদাতা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আমি বারবার আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য: এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্নেহময় পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি দেবকী ও বসুদেবের পুত্র হলেও নন্দ মহারাজের গৃহে লালিত–পালিত হয়ে সকলের হৃদয় জয় করেন। "গোবিন্দ" নাম দ্বারা বোঝায়, তিনি গাভী, ইন্দ্রিয় ও সমগ্র জীবের পরম পালনকর্তা ও আনন্দদাতা। এই শ্লোক আমাদের শেখায় যে, ভগবান কেবল সর্বশক্তিমান নন, তিনি ভক্তদের অতি আপনজনও। তাই বারবার তাঁকে প্রণাম করার মাধ্যমে ভক্তের হৃদয়ে প্রেম, শান্তি ও কৃষ্ণভাবনা জাগ্রত হয়।

কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গঽহং মহীতলে।
ভাগীরথী তটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ।। – (পদ্ম পুরাণ)

অনুবাদ: কলির প্রথম সন্ধ্যায় ভাগীরথী তীরস্থ রম্যস্থানে গৌরাঙ্গ রূপধারী শচীপুত্ররূপে আমি ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হইব।

তাৎপর্য: পদ্ম পুরাণে কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশিত হয়েছে। এখানে ভগবান ঘোষণা করেছেন যে, কলিযুগের প্রারম্ভে তিনি গৌরবর্ণ ধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। ভাগীরথী অর্থাৎ গঙ্গার তীরে নবদ্বীপধামে শচীদেবীর পুত্ররূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে। মহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে প্রেমভক্তির অমূল্য সম্পদ প্রদান করেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের করুণাময় অবতার।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥৬/১৭॥

অনুবাদ: যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন, পরিমিত প্রয়াস করেন, যাঁর নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত জড়–জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তিসাধন করতে পারেন।

তাৎপর্য: এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সংযমপূর্ণ জীবনের গুরুত্ব শিক্ষা দিয়েছেন। অতিরিক্ত ভোগ কিংবা অতিরিক্ত ত্যাগ— উভয়ই মানুষের জন্য ক্ষতিকর। খাদ্য, বিশ্রাম, কাজ ও আচরণ সবকিছু নিয়ম ও পরিমিতির মধ্যে থাকলে মন শান্ত ও স্থির হয়। এমন সুষম জীবনযাপনই প্রকৃত যোগসাধনার সহায়ক এবং দুঃখ দূর করার পথ। এই শ্লোক আমাদের শেখায়, আত্মিক উন্নতির জন্য জীবনে ভারসাম্য ও সংযম অত্যন্ত প্রয়োজন।

মলনির্মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ্ গীতামৃতস্নানং সংসারমলনাশনম্ ।। (গীতা-মাহাত্ম্য ৩)

অনুবাদঃ প্রতিদিন জলে স্নান করে মানুষ নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতে পারে, কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্গীতার গঙ্গাজলে একটি বারও স্নান করে, তা হলে তার জড় জীবনের মলিনতা একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

তাৎপর্যঃ এই শ্লোকে গীতার মাহাত্ম্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিদিন জলে স্নান করলে যেমন শরীরের ময়লা দূর হয়, তেমনি একবারও ভগবদ্গীতার জ্ঞানরূপ অমৃতে স্নান করলে হৃদয়ের অজ্ঞান ও সংসারের কলুষতা দূর হয়। গীতা মানুষের অন্তরকে পবিত্র করে এবং জীবনে সত্য পথের আলো দেখায়। এটি কেবল একটি ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং আত্মার জাগরণের এক চিরন্তন আলোকবর্তিকা। যে ব্যক্তি নিয়মিত গীতা শ্রবণ ও অধ্যয়ন করে, তার জীবন শান্তি, ভক্তি ও ভগবৎ চেতনায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা
জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
-(বৃঃ আরণ্যক উপনিষদ ১/৩/২৮)

অনুবাদঃ অসত্যে থেকোনা, নিত্য সত্যের জগতে গমন কর। অন্ধকারে থেকোনা, জ্যোতির্ময় লোকে গমন কর। জড় দেহ গ্রহণ করে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরে মর না, অমরত্ব লাভ কর।

তাৎপর্যঃ উপনিষদের এই প্রার্থনায় মানবজীবনের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে যেন তিনি আমাদের অসত্য থেকে সত্যের পথে পরিচালিত করেন। অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের ও আত্মিক আলোর পথে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান করা হয়েছে। এছাড়া জন্ম-মৃত্যুর দুঃখময় সংসার থেকে মুক্ত হয়ে অমৃতময় চিরশান্তির পথে পৌঁছানোর প্রার্থনা করা হয়েছে। এই শ্লোক মানুষকে সত্য, জ্ঞান ও আত্ম উন্নতির পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ-৬/৩৮)

অনুবাদঃ সেই সব মহাত্মাগণ, যাঁদের গুরু ও ভগবানে পরা ভক্তি রয়েছে, কেবল তাঁদের কাছেই বৈদিক জ্ঞানের সমস্ত তাৎপর্য স্বতঃই প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্যঃ "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ"—উপনিষদের এই বাণী আমাদের শিক্ষা দেয়, ভগবান ও গুরুর প্রতি অটল ভক্তিই প্রকৃত জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করে। যার হৃদয়ে গুরু ও কৃষ্ণের প্রতি নিঃস্বার্থ শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়, তার জীবন আলোকিত হয়ে ওঠে। বৈদিক জ্ঞানের গভীর তত্ত্ব কেবল বিদ্যার দ্বারা নয়, ভক্তির মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায়। গুরু-ভক্তি ও ভগবদ্ভক্তি মানুষের অন্তরকে পবিত্র করে পরম সত্যের পথে পরিচালিত করে।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা
পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্
তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংষঃ
সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥ –(ঋগবেদ ১/২২/২০)

অনুবাদ: আকাশে প্রসারিত সূর্যরশ্মি যেমন জড় চক্ষুর দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনই বিজ্ঞ ভক্তগণ বিষ্ণুর সেই পরম ধামকেও সর্বদা দর্শন করেন। সেই বিশেষভাবে প্রশংসনীয় ও পরমার্থে জাগ্রত সেই বিপ্রগণ বিষ্ণুর ধামকে দর্শন করতে সক্ষম, তাই সেই পরম ধামকে প্রকাশ করতেও তারা সক্ষম।

তাৎপর্য: "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" — এই মন্ত্র আমাদের শিক্ষা দেয় যে, জাগতিক চক্ষু দিয়ে নয়, ভক্তির দৃষ্টিতেই ভগবানের পরম ধাম উপলব্ধি করা যায়। সূর্য যেমন সর্বত্র আলো ছড়িয়ে দেয়, তেমনি ভগবান বিষ্ণুর কৃপাও সর্বজীবের উপর সমভাবে প্রসারিত। কিন্তু যাঁদের হৃদয় ভক্তি ও শুদ্ধতায় জাগ্রত, তাঁরাই সেই পরম সত্যকে সর্বদা দর্শন করতে সক্ষম হন। বিপ্রগণ সর্বদা ভগবানের চরণে মন নিবিষ্ট রেখে দিব্যচক্ষুর মাধ্যমে তাঁর মহিমা অনুভব করেন।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ –(ঈশোপনিষদ)

অনুবাদ: পরমেশ্বর পূর্ণ, এই জগৎও তাঁর দ্বারা পূর্ণরূপে প্রকাশিত। সেই পূর্ণ পরম সত্য থেকে অসংখ্য পূর্ণ সৃষ্টি প্রকাশ পেলেও তিনি চিরকাল পূর্ণই থাকেন।

তাৎপর্য: এই শ্লোকে ভগবানের অসীম শক্তি ও পূর্ণত্বের বর্ণনা করা হয়েছে। জগতের সবকিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ভগবান থেকে অসংখ্য সৃষ্টি প্রকাশ পেলেও তাঁর শক্তি বা মহিমা কখনো হ্রাস পায় না। এটি আমাদের শেখায় যে, প্রকৃত শান্তি ও পরিপূর্ণতা কেবল ঈশ্বরের সান্নিধ্যেই পাওয়া সম্ভব। তাই মানুষের উচিত ভগবানের উপর নির্ভর করে আত্মিক জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥

অনুবাদ: হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের এই ষোলটি নাম বিশেষত কলিযুগের পাপ নাশের জন্যই উদ্দিষ্ট। নিজেকে কলিযুগের কলুষ থেকে মুক্ত রাখতে হলে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। যুগধর্ম হিসেবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মতো অন্য কোনো মহান পন্থা সমস্ত বৈদিক গ্রন্থে অনুসন্ধান করেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাৎপর্য: "ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্, নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে"— এই শ্লোকে হরিনামের সর্বোচ্চ মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, কলিযুগের সমস্ত পাপ ও কলুষতা দূর করার জন্য এই ষোলো নামের মহামন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সমস্ত বেদ ও শাস্ত্রে এর চেয়ে উত্তম কোনো সাধনপদ্ধতি উল্লেখ করা হয়নি। হরিনাম জপের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় শুদ্ধ হয় এবং ভগবানের প্রতি প্রেম জাগ্রত হয়। তাই কলিযুগে মুক্তি ও শান্তি লাভের জন্য হরিনাম সংকীর্তনই সর্বাধিক সহজ ও কল্যাণময় পথ।

কুইজ

বৈদিক সাধারণ জ্ঞান

০১। প্রশ্ন: ভগবদ্গীতা কোন্ শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত?
উত্তর: ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের একটি অংশ। ২৫ অধ্যায় থেকে ৪২ অধ্যায় পর্যন্ত এই ১৮টি অধ্যায়কে শ্রীমদ্ভগবদগীতা বা গীতোপনিষদ বলা হয়।

০২। প্রশ্ন: শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কোন্ পাঁচটি বিষয় বা তত্ত্ব মুখ্যতঃ আলোচিত হয়েছে?
উত্তর: ভগবদ্গীতায় ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল এবং কর্ম এই পাঁচটি তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

০৩। প্রশ্ন: গীতার জ্ঞান কে কাকে কোন্ স্থানে প্রদান করেছিলেন?
উত্তর: গীতার জ্ঞান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সখা ও শিষ্য অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে প্রদান করেছিলেন।

০৪। প্রশ্ন: যুদ্ধের প্রথম দিকে কৌরব পক্ষের সেনাপতি কে ছিলেন?
উত্তর: পিতামহ ভীষ্মদেব।

০৫। প্রশ্ন: শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবদের শঙ্খের নামগুলি উল্লেখ কর।
উত্তর: শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম–পাঞ্চজন্য, অর্জুনের শঙ্খের নাম– দেবদত্ত, ভীমের শঙ্খের নাম– পৌণ্ড্র, যুধিষ্ঠিরের শঙ্খের নাম–অনন্ত বিজয়, নকুলের শঙ্খের নাম–সুঘোষ ও সহদেবের শঙ্খের নাম– মণিপুষ্পক।

০৬। প্রশ্ন: শ্রীকৃষ্ণের নিকট যথার্থ–জ্ঞানলাভ করার জন্য অর্জুন কী করেছিলেন?
উত্তর: অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে বলেছিলেন– "আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি– আমার কীসে শ্রেয়ঃ লাভ হয় তা আমি বুঝি না। তাই আপনি কৃপা করে আমাকে শিক্ষা দিন–আমি এখন সর্বতোভাবে আপনার শিষ্য ও শরণাগত।"

০৭। প্রশ্ন: সাংখ্যযোগ কথাটির অর্থ কী?
উত্তর: সাংখ্য শব্দটির অর্থ হচ্ছে– যা কোনো কিছুর বিশদ বিবরণ দেয় এবং সাংখ্য বলতে সেই দর্শনকে বোঝায় যা আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে বা আত্মা সম্বন্ধে বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান প্রদান করে। যোগ হচ্ছে ইন্দ্রিয়কে দমন করার পন্থা। সাংখ্যযোগ হচ্ছে চেতন এবং জড়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণমূলক বিষয়বস্তু।

০৮। প্রশ্ন: আত্মা কীভাবে প্রসন্নতা লাভ করতে পারে?
উত্তর: যখন জীব তার নিত্য, শাশ্বত, ভালোবাসার বস্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার সেই লুপ্ত সম্পর্ককে আবার পুনঃস্থাপন করে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করতে পারে তখন সে প্রসন্নতা লাভ করে।

০৯। প্রশ্ন: ভগবান কোথায় থাকেন?
উত্তর: এই জড় জগতের বাইরে চিন্ময় জগৎ বা বৈকুণ্ঠলোক আছে, যেখানে অনেক গ্রহলোক আছে। বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা, বৃন্দাবন ইত্যাদি ধামে ভগবান বিভিন্ন ভগবৎ– স্বরূপে অবস্থান করেন। একইসঙ্গে তিনি পরমাত্মা রূপে সর্বত্র প্রত্যেকটি অণু–পরমাণু ও প্রত্যেকটি জীবের হৃদয়েও বাস করেন।

১০। প্রশ্ন: জড়জগতে বদ্ধ জীব ভগবানের কোন শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়?
উত্তর: জড়জগতে বদ্ধ জীব ভগবানের বহিরঙ্গা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়।

১১। প্রশ্ন: বিভিন্ন যুগে ভগবানকে লাভ করার উপায় কী?
উত্তর: সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপর যুগে অর্চন এবং কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তন।

১২। প্রশ্ন: যজ্ঞ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: যজ্ঞ বলতে ভগবান বিষ্ণুকেই বোঝায়। বেদে বলা হয়েছে–"যজ্ঞ বৈ বিষ্ণু" ভগবানের তুষ্টি বিধানের জন্য কার্যকেই যজ্ঞ বলা হয়।

১৩। প্রশ্ন: ভগবদ্গীতার জ্ঞান কীভাবে পরম্পরাক্রমে প্রচলিত ছিল?
উত্তর: সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞান সূর্যদেব বিবস্বানকে দিয়েছিলেন, বিবস্বান মনুকে বলেছিলেন, মনু ইক্ষাকুকে বলেছিলেন– এইভাবে পরম্পরাক্রমে রাজর্ষিরা এই পরমবিজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

১৪। প্রশ্ন: ভগবান 'অজ' অর্থাৎ জন্ম–রহিত, তবে তিনি কীভাবে বারংবার জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর: ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে স্বীয় মায়ার দ্বারা তাঁর আদি চিন্ময়রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। তিনি তাঁর নিজ ইচ্ছায় তাঁর চিন্ময়রূপে অবতীর্ণ হন বা আবির্ভূত হন। তাঁর শরীরের সৃষ্টি হয় না বরং তাঁর দিব্য শরীরের এই জগতে আবির্ভাব হয়।

১৫। প্রশ্ন: গীতায় কাকে গুড়াকেশ বলা হয়েছে এবং কেন?
উত্তর: অর্জুনকে, কারণ তিনি নিদ্রাকে জয় করতে পেরেছিলেন।

১৬। প্রশ্ন: ভগবদ্গীতায় বর্ণিত শান্তির সূত্রটি কী?
উত্তর: ভগবদ্গীতায় বর্ণিত শান্তির সূত্রের প্রথমাংশ হলো–ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত লোকের মহেশ্বর এবং তৃতীয়টি হচ্ছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। এই তিনটি বিষয় জানতে পারলে জড় জগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তিলাভ করে মানুষ যথার্থ শান্তিপ্রাপ্ত হতে পারবে।

১৭। প্রশ্ন: মন কার বন্ধু এবং কার শত্রুরূপে কাজ করে?
উত্তর: যে তার মনকে জয় করে নিজের বশীভূত করে রেখেছে তার মন তার পরম বন্ধুরূপে কাজ করে কিন্তু যে মনকে জয় করতে না পেরে মনের বশীভূত হয়েছে, তার মন শত্রুরূপে কাজ করে।

১৮। প্রশ্ন: কার পক্ষে যোগী হওয়া সম্ভব নয়?
উত্তর: যারা অধিক ভোজন করে, নিতান্ত নিরাহারে থাকে, এবং অধিক নিদ্রাপ্রিয় বা নিদ্রাশূন্য তাদের পক্ষে যোগী হওয়া সম্ভব নয়।

১৯। প্রশ্ন: সমস্ত প্রকার যোগীদের মধ্যে কোন যোগী শ্রেষ্ঠ?
উত্তর: সমস্ত প্রকার যোগীদের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধা সহকারে 'মদ্গত চিত্তে' অর্থাৎ কৃষ্ণগতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণতেই আসক্ত হয়ে অন্তরে সবসময় তাঁর কথা চিন্তা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী। তিনি সব থেকে অন্তরঙ্গভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন।

২০। প্রশ্ন: ভগবানের উৎকৃষ্টা পরাপ্রকৃতি বলতে কাকে বোঝায়?
উত্তর: ভগবানের পরাপ্রকৃতি হচ্ছে চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়েছে এবং ঐ পরাপ্রকৃতিই জড়জগৎকে ধারণ করে আছে।

২১। প্রশ্ন: কোন চার প্রকারের সুকৃতিবান ব্যক্তি ভগবানের ভজনা করেন?

উত্তর: আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী– এই চার প্রকারের সুকৃতিবান ব্যক্তি ভগবানের ভজনা করেন।

২২। প্রশ্ন: অধিদৈব কাকে বলে?

উত্তর: চন্দ্র সূর্য–আদি সমস্ত দেবতাদের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ সমস্ত দেবতাদের সমষ্টিরূপ বিরাট পুরুষকে অধিদৈব বলে।

২৩। প্রশ্ন: আমরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি কেন?

উত্তর: হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র হচ্ছে "কলিকল্মষনাশনম্", "চেতদর্পণ–মার্জনম্" অর্থাৎ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রই একমাত্র কলির সমস্ত কলুষ নাশ করতে পারে এবং চিত্তরূপ দর্পণকে পরিষ্কার করে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করতে পারে। এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র হচ্ছে মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ জড়বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার একমাত্র পথ।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নামই হচ্ছে একমাত্র পন্থা। এছাড়া আর কোনো গতি নেই, আর কোনো গতি নেই, আর কোনো গতি নেই।

২৪। প্রশ্ন: ISKCON-এ G.B.C কথার অর্থ কী?

উত্তর: GOVERNING BODY COMMISSION অর্থাৎ সর্বোচ্চ পরিচালকমণ্ডলী। এই পরিচালকমণ্ডলী শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিনিধি রূপে সমস্ত বিশ্বে ISKCON–এর রক্ষণাবেক্ষণ, আচার–প্রচার ও শাস্ত্র অনুযায়ী সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। G.B.C–এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

২৫। প্রশ্ন: ত্রিতাপ ক্লেশ কী?

উত্তর: জড় জগতে অবস্থানকালে জীবাত্মা যে তিন রকম অবশ্যম্ভাবী দুঃখ ভোগ করে তাকে বলা হয় ত্রিতাপ ক্লেশ।

সেগুলি হচ্ছে: (i) আধ্যাত্মিক ক্লেশ (ii) আধিভৌতিক ক্লেশ ও (iii) আধিদৈবিক ক্লেশ

জীব তার নিজের মন ও শরীর থেকে যে ক্লেশ প্রাপ্ত হয় তা আধ্যাত্মিক ক্লেশ। যেমন–মানসিক কষ্ট, রোগ ব্যাধি ইত্যাদি।

অন্য জীব থেকে প্রাপ্ত ক্লেশকে আধিভৌতিক ক্লেশ বলা হয়। যেমন–সাপের কামড়, মশা–মাছি, চোর–গুণ্ডার উপদ্রব ইত্যাদি।

দৈবক্রমে অর্থাৎ দেবতাদের দ্বারা প্রদত্ত যে ক্লেশ, তাকে আধিদৈবিক ক্লেশ বলা হয়। যেমন: অনাবৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি।

২৬। প্রশ্ন: পুনর্জন্ম কী?

উত্তর: জীবাত্মা যে শরীরের মধ্যে অবস্থান করে সেই শরীর কৌমার থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বার্ধক্য অবস্থায় ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু দেহস্থ আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। ঠিক যেমন পুরোনো কাপড় পরিত্যাগ করে নতুন কাপড় পরিধান করা হয়, তেমনি জীবাত্মা ব্যবহার–অযোগ্য জরাজীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে তার কর্ম এবং বাসনা অনুসারে আরেকটি নতুন শরীর গ্রহণ করে। আত্মার এই নতুন শরীর ধারণকে বলা হয় পুনর্জন্ম।

২৭। প্রশ্ন: কর্মবন্ধন কী?

উত্তর: জীব এই জগতে বিভিন্ন জড় কামনা বাসনা নিয়ে কর্ম করে থাকে। ফলে সে তার প্রতিটি কৃতকর্মের ফলভোগ করতে বাধ্য থাকে। সেই কর্ম অনুসারে তাকে বার বার জড় শরীর ধারণ করতে হয়। নতুন শরীরে সে নতুন কর্ম করে এবং ঐসব কর্মের ফল ভোগের জন্য আবার তাকে জন্ম নিতে হয়; এ রকম চলতেই থাকে। এইরূপ বদ্ধ অবস্থাকে বলা হয় কর্মবন্ধন।

২৮। প্রশ্ন: জীবের চরম লক্ষ্য কী?

উত্তর: জীবের চরম লক্ষ্য হচ্ছে– পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার হারানো সম্পর্ককে পুনঃস্থাপন করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমূলক সেবায় নিযুক্ত হওয়া, অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা।

২৯। প্রশ্ন: ভগবান কে?

উত্তর: ভগবান কথাটি বিশ্লেষণ করে পরাশর মুনি বলেছেন যে, সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য এই ছয়টি ঐশ্বর্য যাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে বর্তমান, সেই পরম পুরুষ হচ্ছেন ভগবান।" মানুষের মধ্যে অনেককে খুব ধনী, যশস্বী ও জ্ঞানী হতে দেখা যায়, কিন্তু জগতে এমন কেউ নেই যার মধ্যে উক্ত ছয়টি গুণ পূর্ণরূপে বিদ্যমান। এমনকি ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের মধ্যেও তা আংশিকভাবে রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন। তাই তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই।

৩০। প্রশ্ন: ভক্তি কীভাবে লাভ করা যায়?

উত্তর: "ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন উপজায়তে" অর্থাৎ ভগবানের ভক্তের সঙ্গ করার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায়।

৩১। প্রশ্ন: সমাজের যথার্থ কল্যাণ কীভাবে সাধিত হবে?

উত্তর: সমাজের সমস্ত মানুষকে যদি কৃষ্ণচেতনায় উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলেই সমাজের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হয়। কারণ কৃষ্ণচেতনাই চেতনার উচ্চতম স্তর।

৩২। প্রশ্ন: কোন কুণ্ড থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি হয়?

উত্তর: ব্রহ্মকুণ্ড থেকে।

৩৩। প্রশ্ন: প্রত্যাহার কী?

উত্তর: ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সব কয়টি দ্বার বন্ধ করাকে প্রত্যাহার বলে।

৩৪। প্রশ্ন: ভগবানের অনন্ত শক্তিকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

উত্তর: ভগবানের অনন্ত শক্তিকে তিনভাবে বিভক্ত করা হয়েছে,
(i) অন্তরঙ্গা শক্তি (ii) বহিরঙ্গা শক্তি এবং (iii) তটস্থা শক্তি।

৩৫। প্রশ্ন: যথার্থ জ্ঞান কাকে বলে?

উত্তর: আমি এই 'শরীর' নই, আমি চিন্ময় 'আত্মা'–ভগবানের নিত্য অংশ। এটি জানাকে বলা হয় যথার্থ জ্ঞান।

৩৬। প্রশ্ন: "অম্লান্" কথাটির অর্থ কী?

উত্তর: নির্মল, অর্থাৎ রজোগুণ ও তমোগুণ থেকে মুক্ত ।

৩৭। প্রশ্ন: "প্রণব" কাকে বলে?

উত্তর: সমস্ত বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্যে ওঁ শব্দটিকে বলা হয় প্রণব।

৩৮। প্রশ্ন: "সৃজামি" শব্দটির অর্থ কী?

উত্তর: সৃজামি শব্দটির অর্থ ভগবানের যা স্বরূপ সেভাবেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন।

৩৯। প্রশ্ন: গীতায় বর্ণিত "নির্বৈরঃ" শব্দটির অর্থ কী?

উত্তর: শত্রুভাবরহিত, অর্থাৎ যিনি সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন।

৪০। প্রশ্ন: "অভিজাতস্য" শব্দটির অর্থ কী?

উত্তর: দৈবগুণসম্পন্ন, অর্থাৎ দিব্যগুণে যার জন্ম হয়েছে।

৪১। প্রশ্ন: অহিংসা শব্দের প্রকৃত অর্থ কী?

উত্তর: অহিংসা হচ্ছে অপরের অনিষ্টসাধন না করা বা অপরকে বিভ্রান্ত না করা। অহিংসা শব্দটির যথার্থ অর্থ হচ্ছে মানব সমাজের মঙ্গল কীভাবে হবে, মানব দেহের যথার্থ সদ্ব্যবহার কিভাবে করতে হবে সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া এবং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান দান করার মাধ্যমে দিব্য আনন্দ প্রাপ্তির পথে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

৪২। প্রশ্ন: মৌন শব্দের প্রকৃত অর্থ কী?

উত্তর: মৌন শব্দের সাধারণ অর্থ কথা না বলা, কিন্তু প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণকথা, ভগবদ্ভক্তিমূলক কথা ছাড়া বাজে কথা না বলা। যিনি সর্বক্ষণ কৃষ্ণকথা বলেন তিনিই প্রকৃত অর্থে মৌনী।

৪৩। প্রশ্ন: কোন গুণ কীভাবে জীবকে আবদ্ধ করে?

উত্তর: সত্ত্বগুণ জীবকে আমি সুখী এই প্রকার সুখাসক্তির দ্বারা ও আমি জ্ঞানী এই প্রকার জ্ঞানাসক্তির দ্বারা আবদ্ধ করে। রজোগুণ জীবকে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করে। তমোগুণ জীবকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা আবদ্ধ করে।

৪৪। প্রশ্ন: শুচিতা কয় প্রকার ও কী কী ? আলোচনা কর।

উত্তর: শুচিতা দুই প্রকার – ১। বাইরের শুচিতা, ২। অন্তরের শুচিতা। বাইরের শুচিতা হচ্ছে পরিস্কার–পরিচ্ছন্ন থাকা, নিয়মিত স্নান করা ইত্যাদি। আর অন্তরের শুচিতা হচ্ছে সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করা এবং "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" এই মহামন্ত্র জপ ও কীর্তন করা। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্বকৃত কর্মের ফলে সঞ্চিত চিত্তের সমস্ত আবর্জনা দূরীভূত হয়। পারমার্থিক উন্নতি লাভের জন্য উভয় শুচিতার অত্যন্ত প্রয়োজন।

৪৫। প্রশ্ন: সর্ব প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও। এই বাক্যের যথার্থ মর্মার্থ কী?

উত্তর: ভগবান নানা রকম জ্ঞান ও নানা রকম ধর্মের বর্ণনা করেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানের ও পরমাত্মা জ্ঞানের বর্ণনা করেছেন, সমাজ জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমের বর্ণনা করেছেন, সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞান, বৈরাগ্যের জ্ঞান , মন ও ইন্দ্রিয় দমন, ধ্যান আদি সব কিছুরই বর্ণনা করেছেন। তিনি বিবিধ উপায়ে নানা প্রকার ধর্মের বর্ণনা করে শেষে এই সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে তাঁর শ্রীচরণকমলে শরণাগত হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন যা ভগবদ্গীতার সর্বগুহ্যতম জ্ঞান ও যথার্থ মর্মার্থ।

৪৬। প্রশ্ন: বেদের জ্ঞান কীভাবে প্রবাহিত হয়েছে?

উত্তর: বৈদিক জ্ঞান এসেছে অপ্রাকৃত জগৎ হতে– শ্রীকৃষ্ণ থেকে। বেদের আর একটি নাম হচ্ছে শ্রুতি। সর্বপ্রথম লাভ করেছিলেন ব্রহ্মা, তারপর পরম্পরাক্রমে এই ত্রুটিমুক্ত জ্ঞান প্রবাহিত হয়।

৪৭। প্রশ্ন: অষ্টসিদ্ধি কী কী?

উত্তর: অষ্টসিদ্ধি হচ্ছে–

অণিমা – এই সিদ্ধির প্রভাবে খুব ছোট হয়ে যাওয়া যায়।

লঘিমা – এর প্রভাবে হাল্কা হয়ে যাওয়া যায়, ফলে অনায়াসে বায়ুতে বা জলে ভেসে থাকা যায়।

মহিমা – বিশাল আকার ধারণ করতে পারা যায়।

প্রাপ্তি – যোগী তাঁর হাতকে প্রসারিত করে যেকোনো গ্রহলোক থেকে ইচ্ছামতো জিনিস সংগ্রহ করতে পারেন।

ঈশিতা – ইচ্ছার দ্বারা একটি সম্পূর্ণ গ্রহ সৃষ্টি করা বা ধ্বংস করা যায়।

বশিতা – যে কোনো মানুষকে বশীভূত করা যায়।

প্রাকাম্য – মনের যে কোনো বাসনা পূর্ণ করা যায়। প্রকৃতিতে অদ্ভূত কর্ম সংঘটন করা যায়।

কামবশয়িতা – প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এটি এক রকমের যাদুবিদ্যা।

৪৮। প্রশ্ন: মায়ার সবচেয়ে কঠিন ফাঁদ কী?

উত্তর: জড়াপ্রকৃতিতে জীবাত্মা তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং নিজেকে ভোক্তা বলে মনে করে। এই বিকৃত মনোবৃত্তির সবচেয়ে অধঃপতিত অবস্থার প্রকাশ হয়, যখন তারা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনায় মুক্তি কামনা করে এবং তার পরিণতিতে নিজেদেরকেই ভগবান বলে জাহির করতে চেষ্টা করে। এটাই হচ্ছে মায়ার সবচেয়ে কঠিন ফাঁদ । কারণ তথাকথিত মুক্তিকামীরা মায়ামুক্ত হতে গিয়ে মায়ার সবচেয়ে জটিল ফাঁদে আটকে যায়।

৪৯। প্রশ্ন: ধর্ম ও অধর্ম কী?

উত্তর: ভগবানের আইনই হচ্ছে ধর্ম। ধর্মের তত্ত্ব বেদে নির্দেশিত হয়েছে এবং বেদের এই নির্দেশগুলির যথাযথ আচার না করাটাই হচ্ছে অর্ধম। বেদ ভগবানেরই বাণী এবং ব্রহ্মার হৃদয়ে তিনি এই জ্ঞান সঞ্চার করেন। তাই ধর্মের বিধান হচ্ছে সরাসরিভাবে ভগবানের আদেশ (ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ প্রণীতম্)।

৫০। প্রশ্ন: ভক্তসঙ্গে প্রীতি বিনিময়ের ছয়টি প্রধান লক্ষণ কী কী?

উত্তর: ভক্তসঙ্গে প্রীতি বিনিময়ের ছয়টি প্রধান লক্ষণ:

১। ভক্তকে কিছু দান করা।

২। ভক্তের প্রতিদান গ্রহণ করা।

৩। ভক্তের নিজের মনের কথা অন্য ভক্তকে ব্যক্ত করা।

৪। অন্য ভক্তের মনের কথা শোনা।

৫। ভক্তের দেওয়া ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করা।

৬। ভক্তকে ভগবৎ প্রসাদ প্রদান করা।

৫১। প্রশ্ন: "মহারথী" কাদের বলা হয়?
উত্তর: যাঁরা অস্ত্র এবং শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং যুদ্ধে একাকীই দশ হাজার ধনুর্ধারী যোদ্ধাকে পরিচালনা করতে সক্ষম, তাদের 'মহারথী' বলা হয়।

৫২। প্রশ্ন: অর্জুনের শঙ্খের বিশেষত্ব কী ছিল?
উত্তর: নিবাতকবচ দৈত্যদের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধের সময় অর্জুন দেবতাদের পক্ষে যুদ্ধ করে ঐ সমস্ত দৈত্যদের বধ করেছিলেন। সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনকে এই শঙ্খটি উপহার দিয়েছিলেন। এই শঙ্খের ধ্বনি অত্যন্ত জোরে হতো, যার ফলে শত্রুসৈন্য ভীতচকিত হতো।

৫৩। প্রশ্ন: শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম 'পাঞ্চজন্য' কেন হয়েছিল?
উত্তর: শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চজন নামক দৈত্যকে বধ করে তার শঙ্খরূপ দেহটিকে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁর শঙ্খের নাম হয়েছিল পাঞ্চজন্য।

৫৪। প্রশ্ন: অর্জুনের রথের নাম কী ছিল? এরূপ নাম হওয়ার কারণ কী?
উত্তর: কপিধ্বজ। অর্জুনের রথে হনুমান চিহ্নিত পতাকা শোভা পাচ্ছিল, তাই এরকম নাম হয়েছিল।

৫৫। প্রশ্ন: "আর্য" কাদের বলা হয়?
উত্তর: যারা জীবনের প্রকৃত মূল্য বোঝেন এবং যাদের সভ্যতা অধ্যাত্ম উপলব্ধির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কর্তব্য প্রাপ্ত হন তা নিজ কল্যাণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে উৎসাহ এবং তৎপরতা সহকারে সুষ্ঠুভাবে সমাপন করেন। নিজ কর্তব্য পালনে এদের মধ্যে কোন কাপুরুষতা দেখা দেয়না।

৫৬। প্রশ্ন: "ধীর" কাকে বলা হয়?
উত্তর: যে ব্যক্তি দেহ, আত্মা, পরমাত্মা এবং বিনাশশীল জড় জগৎ ও শাশ্বত চিন্ময় জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত, তাঁকে বলা 'ধীর'। এই প্রকার মানুষ জড় দেহের পরিবর্তনের জন্য কখনো শোক করেন না। দেহ এবং দেহী (আত্মা) সর্বতোভাবে পৃথক এই বিষয়ে তিনি কখনোও মোহগ্রস্ত হন না।

৫৭। প্রশ্ন: "অমৃতত্ত্ব" লাভের প্রকৃত অধিকারী কে?
উত্তর: এই মনুষ্য জন্ম সুখ–দুঃখ ভোগ করার জন্য সৃষ্ট নয়, বরং সুখ–দুঃখ ছাড়িয়ে মহৎ আনন্দ, পরম শান্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট। যিনি সুখ–দুঃখে সমভাব সম্পন্ন, তিনিই অমৃতত্ত্ব (মুক্তি) লাভের প্রকৃত অধিকারী।

৫৮। প্রশ্ন: "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি" কাকে বলে?
উত্তর: কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত নিঃশঙ্কচিত্তে বিশ্বাস করেন যে ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করলে সমস্ত কর্তব্যকর্ম সম্পাদিত হয় এবং ভগবান তাঁকে এই জড় জগতের বন্ধনমুক্ত করে ভগবৎ ধামে তাঁর নিজের কাছে নিয়ে যান। এই বিশ্বাসকে বলা হয় ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। অর্থাৎ এই বুদ্ধি একনিষ্ঠ থাকে, নানাদিকে ধাবিত হয়না।

৫৯। প্রশ্ন: "অসম্মূঢ়" কাকে বলা হয়?
উত্তর: যে পরমতত্ত্ব সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান তা অনুভব না করা এবং যার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই সেই উৎপত্তি ও বিনাশশীল জগৎ সংসারকে সত্য বলে মনে করা একে মূঢ়তা বলা হয়। এই মূঢ়তা যার মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ অপসারিত হয়েছে, এখানে তাঁকেই "অসম্মূঢ়" বলা হয়।

৬০। প্রশ্ন: স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কীরূপে অবস্থান করেন?

উত্তর: কূর্ম (কচ্ছপ) যেমন তার ছয়টি অঙ্গ (চারটি পা, মাথা ও লেজ) তার কঠিন খোলসের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে অবস্থান করে, তেমনি স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও মন সহ পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে তাদের নিজ নিজ বিষয় (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) থেকে প্রত্যাহার করে অবস্থান করেন। অর্থাৎ তিনি বিষয়গুলো নিয়ে কখনো মনে কোনো চিন্তা আসতে দেন না।

৬১। প্রশ্ন: সৃজামি কথাটির তাৎপর্য কী?

উত্তর: 'সৃজামি' অর্থ প্রকাশ করা, সৃষ্টি করা নয়। ভগবানের সমস্ত রূপ–ই শাশ্বত, নিত্য বিদ্যমান। সৃজামি কথাটির তাৎপর্য হল ভগবান তাঁর স্বরূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে অজ্ঞ, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের (নির্বিশেষবাদীদের) সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান করেন।

৬২। প্রশ্ন: 'বিশুদ্ধাত্মা' কাকে বলে?

উত্তর: জড় জাগতিক বস্তুগুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য অন্তঃকরণে সেই বস্তুগুলি পাওয়ার এবং তার থেকে সুখভোগ করার কামনা জাগ্রত হয় যার ফলে অন্তঃকরণ দূষিত হয়। যাঁর অন্তঃকরণ নিষ্কাম, তিনিই বিশুদ্ধাত্মা, তিনি জানেন কৃষ্ণই সবকিছুর মালিক এবং কৃষ্ণই ভোক্তা।

৬৩। প্রশ্ন: মানসিক তপস্যা কাকে বলে?

উত্তর: চিত্তের প্রসন্নতা, অকপটতা, মৌনতা, আত্মসংযম এবং সত্তার পবিত্রকরণ।

৬৪। প্রশ্ন: কায়িক তপস্যা কাকে বলে?

উত্তর: পরমেশ্বর ভগবান, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা এবং শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অসিংসা পালন।

৬৫। প্রশ্ন: বাচিক তপস্যা কাকে বলে?

উত্তর: অনুদ্বেগকর, সত্য প্রিয় অথচ হিতকর বাক্য বলা এবং বৈদিক শাস্ত্র পাঠ।

৬৬। প্রশ্ন: 'জিতাত্মা' ব্যক্তি কাকে বলে?

উত্তর: যে ব্যক্তি শরীর–ইন্দ্রিয়াদি–মন–বুদ্ধি ইত্যাদি কোন প্রাকৃত পদার্থকে নিজের বলে মনে করে না এবং ঐ প্রাকৃত পদার্থগুলির সঙ্গে কিছু মাত্র আপনভাব রাখে না তাকে বলা হয়' জিতাত্মা'। জিতাত্মা ব্যক্তি নিজের মঙ্গল তো করেই, তার দ্বারা জগতেরও অনেক উপকার হয়।

৬৭। প্রশ্ন: ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাকে তার প্রিয়ভক্ত বলেছেন?

উত্তর: যিনি সমস্ত জীবের প্রতি দ্বেষশূন্য, বন্ধুভাবাপন্ন, কৃপালু, নিরহংকার, সুখ–দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট এবং সর্বদা ভক্তিযোগে যুক্ত এই প্রকার ভক্ত ভগবানের প্রিয়।

৬৮। প্রশ্ন: কে পুরুষোত্তম নামে বিখ্যাত এবং কেন?

উত্তর: ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, 'যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর থেকেও উত্তম সেহেতু জগৎ ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে বিখ্যাত।'

৬৯। প্রশ্ন: মহাজন কারা?

উত্তর: স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা), নারদ, শম্ভু (শিব), কুমার (ব্রহ্মার চার পুত্র– সনক, সনাতন, সনৎকুমার ও সনন্দ), কপিল (দেবহুতির পুত্র), মনু, প্রহ্লাদ, জনক (সীতার পিতা), ভীষ্মদেব, বলি মহারাজ, বৈয়াসকি (ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব) এবং যমরাজ এই দ্বাদশ জনকে মহাজন বলা হয়।

৭০। প্রশ্ন: কে কোন প্রকার ভক্তি অবলম্বন করে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন?

উত্তর: শ্রবণে–পরীক্ষিৎ মহারাজ, কীর্তনে–শুকদেব গোস্বামী, স্মরণে–প্রহ্লাদ মহারাজ, পাদসেবনে–লক্ষ্মী দেবী, বন্দনে–অক্রুর, অর্চনে–পৃথু মহারাজ, দাস্যে–হনুমান, সখ্যে–অর্জুন, এবং আত্মনিবেদনে–বলি মহারাজ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

৭১। প্রশ্ন: জ্ঞানযোগী কাকে বলে?

উত্তর: যাঁরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করে ব্রহ্মে লীন হওয়ার জন্য প্রয়াস করে, তাদের জ্ঞানযোগী বলা হয়।

৭২। প্রশ্ন: শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে কী প্রচার করেছিলেন?

উত্তর: শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনের মাধ্যমে কিভাবে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায় তা প্রদর্শন ও প্রচার করেছিলেন।

৭৩। প্রশ্ন: অবতার বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: যখন ভগবান চিন্ময় ধাম থেকে এই জড়জগতে অবতরণ করেন তখন তাকে অবতার বলে।

৭৪। প্রশ্ন: অবতারী কে এবং কেন?

উত্তর: শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একমাত্র অবতারী কারণ তার থেকে সকল অবতারগণ প্রকাশিত হন।

৭৫। প্রশ্ন: ভগবান কেন অবতীর্ণ হন?

উত্তর: সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন।

৭৬। প্রশ্ন: বিভিন্ন যুগে মানুষের আয়ুর বর্ণনা কর।

উত্তর: সত্য– ১ লক্ষ বছর, ত্রেতা– ১০ হাজার বছর, দ্বাপর– ১ হাজার বছর, কলি– ১০০ বছর।

৭৭। প্রশ্ন: ব্রহ্মসংহিতা কার প্রার্থনা ?

উত্তর: ব্রহ্মার প্রার্থনা।

৭৮। প্রশ্ন: বর্ণ ও আশ্রম কয়টি ও কী কী?

উত্তর: (বর্ণ: ৪টি–ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র) (আশ্রম: ৪টি–ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস)।

৭৯। প্রশ্ন: সপ্তমাতা কে কে?

উত্তর: জন্মদাত্রী মাতা, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণ পত্নী, রাজ মাতা, গাভী মাতা, ধাত্রী মাতা ও পৃথিবী মাতা।

৮০। প্রশ্ন: পঞ্চতত্ত্ব কে কে?

উত্তর: শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত আচার্য, গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাস ঠাকুর।

৮১। প্রশ্ন: ভগবানকে কেন অচ্যুত বলা হয়?
উত্তর: ভগবান ভক্তের প্রতি করুণা প্রদর্শনে কখনও চ্যুত হন না। তাই তাকে অচ্যুত বলা হয়।

৮২। প্রশ্ন: জীবের প্রকৃত সমস্যা বা দুঃখ কী?
উত্তর: জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি।

৮৩। প্রশ্ন: মানুষের প্রধান শত্রু কয়টি ও কী কী?
উত্তর: প্রধান শত্রু ৬টিঃ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য।

৮৪। প্রশ্ন: নরকের ৩ টি দ্বার কী কী?
উত্তর: কাম, ক্রোধ, লোভ।

৮৫। প্রশ্ন: মহাপ্রভুর পিতা মাতার আদি বাসস্থান কোথায় ?
উত্তর: ঢাকা দক্ষিণ, সিলেট।

৮৬। প্রশ্ন: নবদ্বীপ কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
উত্তর: গঙ্গা নদীর।

৮৭। প্রশ্ন: বৃন্দাবন কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
উত্তর: যমুনা নদীর।

৮৮। প্রশ্ন: শ্রীমদ্ভগবদগীতার জ্ঞান কোথায় প্রদান করা হয়?
উত্তর: কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে।

৮৯। প্রশ্ন: ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাকে সর্বপ্রথম গীতার জ্ঞান প্রদান করেছেন?
উত্তর: সূর্যদেব, বিবস্বানকে।

৯০। প্রশ্ন: শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা কে?
উত্তর: শ্রীল ব্যাসদেব।

৯১। প্রশ্ন: শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক কয়টি?
উত্তর: ১৮ হাজার।

৯২। প্রশ্ন: রামায়ণের রচয়িতা কে?
উত্তর: বাল্মিকী মুনি।

৯৩। প্রশ্ন: মহাভারতের রচয়িতা কে?
উত্তর: মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব।

৯৪। প্রশ্ন: মহাভারতের শ্লোক কয়টি?
উত্তর: ১ লক্ষ।

৯৫। প্রশ্ন: বিশ্বের সর্ববৃহৎ পারমার্থিক গ্রন্থ প্রকাশনী সংস্থার নাম কী?
উত্তর: ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট।

৯৬। প্রশ্ন: সর্ববৃহৎ জগন্নাথ মন্দির কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: উড়িষ্যার পুরীধামে।

৯৭। প্রশ্ন: পাপ পূণ্যের হিসাব কে রাখেন?

উত্তর: চিত্রগুপ্ত।

৯৮। প্রশ্ন: ধ্রুব মহারাজ কোথায় তপস্যা করেছিলেন?

উত্তর: বৃন্দাবনের মধুবনে।

৯৯। প্রশ্ন: বেদের জ্ঞান প্রথম কে কাকে প্রদান করেন?

উত্তর: শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে।

১০০। প্রশ্ন: ব্রাহ্মণের কয়টি গুণ থাকা উচিত?

উত্তর: ৯ টি।

১০১। প্রশ্ন: প্রহ্লাদের পিতা ও মাতার নাম কী?

উত্তর: হিরণ্যকশিপু ও কয়েদু।

১০২। প্রশ্ন: বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল কারা?

উত্তর: জয় ও বিজয়।

১০৩। প্রশ্ন: হিরণ্যকশিপু কার নিকট হতে বর লাভ করেন?

উত্তর: ব্রহ্মা।

১০৪। প্রশ্ন: গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদী কোথায় মিলিত হয়েছে?

উত্তর: প্রয়াগ।

১০৫। প্রশ্ন: প্রতি ৩ বছর পরপর অতিরিক্ত যে মাস আসে তার নাম কী?

উত্তর: পুরুষোত্তম মাস।

১০৬। প্রশ্ন: শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত কে রচনা করেছেন?

উত্তর: কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।

১০৭। প্রশ্ন: কাকে বৃকোদর বলা হয় ও কেন?

উত্তর: ভীমকে বৃকোদর বলা হয়। তিনি প্রচুর পরিমাণে আহার করতে পারতেন। তিনি হিড়িম্ব আদি দানবকে বধ করেছিলেন।

১০৮। প্রশ্ন: হৃষিকেশ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: হৃষিকেশ অর্থ 'ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর'। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রিয় গুলোকে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত করেন, তাই তাকে হৃষিকেশ বলা হয়েছে।

কুইজ

উপাখ্যানে উপদেশ

দৃঢ়তা

অনেক কাল আগে উত্তানপাদ নামে এক রাজা ছিলেন এবং তাঁর দুই স্ত্রী ছিল সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতির পুত্র ধ্রুব এবং সুরুচির পুত্র উত্তম। সুরুচি তার পুত্রকে রাজা করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি ধ্রুবকে বেশি পছন্দ করতেন না।

একদিন উত্তম তার পিতার কোলে বসেছিল। ছোট্ট ধ্রুব তা দেখে সেও পিতার কোলে বসতে চাইল কিন্তু বিমাতা সুরুচি কঠোরভাবে তাকে বললেন, "চলে যাও এখান থেকে। আমার পুত্র ছাড়া কেউ, রাজার কোলে বসতে পারবে না। যদি তুমি বসতে চাও তবে আমার পুত্র হয়ে জন্ম নাও।" বিমাতার কথায় ধ্রুব অনেক কষ্ট পেল এবং মাতা সুনীতির কাছে গিয়ে বলল, "আমি আমার পিতার চেয়েও বড় রাজ্য চাই যা ত্রিভুবনে কেউ লাভ করেনি। মাতা সুনীতি তখন দুঃখের সাথে বললেন, "তুমি বনে গিয়ে ভগবানকে সন্তুষ্ট কর। তিনিই তোমার সব ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন।

ধ্রুব সেদিন রাতেই বনে চলে গেলেন। ধ্রুবের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। ধ্রুব ভগবান বিষ্ণুকে খুঁজতে লাগলেন। এমন সময় নারদমুনি ধ্রুবকে দর্শন দিলেন। ধ্রুব তখন নারদমুনিকে গুরুরূপে গ্রহণ করলেন। নারদমুনি তখন ধ্রুবকে বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার উপায় বললেন। গুরুকৃপা লাভ করে ধ্রুব ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলেন।

ধ্রুব মহারাজ প্রত্যহ যমুনায় স্নান করতেন ও নিয়মিত ভাবে গুরুদেব প্রদত্ত –'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্র জপ করতেন।

দীর্ঘ ছয় মাস কঠোর তপস্যার পর ভগবান বিষ্ণু ধ্রুবকে দর্শন দিলেন এবং বর দান করলেন। তারপর ধ্রুব ৩৬০০০ বছর তার পিতার রাজত্ব শাসন করে ধ্রুবলোকে গমন করেন। এভাবে ধ্রুব শিশুকালেই কঠোর তপস্যা ও দৃঢ়তার কারণে ভগবানকে লাভ করেন।

হিতোপদেশ : দৃঢ়তাই সফলতার চাবিকাঠি।

প্রকৃত সেবক

ত্রেতা যুগের কথা। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর ভাই লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট থেকে উদ্ধার করার জন্য লঙ্কায় গিয়েছিলেন। বানররাজ সুগ্রীব এবং তার সৈন্যরাও শ্রীরামচন্দ্রকে যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য লঙ্কায় গিয়েছিলেন। যুদ্ধের একপর্যায়ে লক্ষ্মণ এবং রাবণের পুত্র মেঘনাদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হয়। তারা দুজনই পরাক্রমশালী যোদ্ধা ছিলেন। দুজনের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছিল। যুদ্ধের এক পর্যায়ে লক্ষ্মণের পরাক্রমের সাথে পেরে উঠতে না পেরে মেঘনাদ কপটতা করে পেছন দিক থেকে বীর ঘাতিনী অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। সেই অস্ত্রের আঘাতে লক্ষ্মণ শক্তিহীন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এই দৃশ্য দেখে রামভক্ত হনুমান সাথে সাথে লক্ষ্মণের সামনে এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে নিজেদের শিবিরে চলে এলেন। নিজ ভাই লক্ষ্মণের এই অবস্থা দেখে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র খুব ব্যথিত হলেন। তিনি লক্ষ্মণকে সুস্থ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। তখন বিভীষণ লঙ্কার রাজবৈদ্য সুষেনকে দিয়ে লক্ষ্মণের চিকিৎসা করার পরামর্শ প্রদান করলেন। হনুমান তখন শ্রীরামচন্দ্রের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করে লঙ্কার রাজবৈদ্যকে তার ঘরসহ তুলে নিয়ে এলেন। প্রথমে শত্রু পক্ষের হওয়াতে লক্ষ্মণের চিকিৎসা করতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং হনুমানের প্রার্থনায় তিনি পরে রাজি হন। সুষেন বৈদ্য লক্ষ্মণের আশঙ্কাজনক মুক্তি লাভের জন্য হিমালয়ের গন্ধমাদন পর্বত থেকে মৃত সঞ্জীবনী নিয়ে আসতে বলেন। কিন্তু শর্ত হলো হিমালয় থেকে সূর্য উদয়ের পূর্বে মৃত সঞ্জীবনী নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে ফিরে আসা ছিল প্রায় অসম্ভব। কিন্তু শ্রীরামের অনুগত ভক্ত হনুমান এই কার্য সম্পাদনের জন্য এগিয়ে এলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে হিমালয়ের দিকে 'জয় শ্রীরাম' বলে যাত্রা করলেন। যাত্রার মাঝপথে কালনিমি নামক এক রাক্ষস ঋষির ছদ্মবেশ ধারণ করে হনুমানের যাত্রায় বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু হনুমান ছদ্মবেশ ধারণ করা রাক্ষস কালনিমিকে চিনতে পেরে তাকে বধ করে তারপর তিনি পুনরায় যাত্রা করেন। গন্ধমাদন পর্বতের কাছে এসে তিনি সেই পর্বত রক্ষাকারী দেবতাদের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করেন এবং তার এখানে আসার কারণ ব্যক্ত করেন। পর্বত রক্ষাকারী দেবতা হনুমানের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পর্বত থেকে মৃত সঞ্জীবনী বৃক্ষ নিতে অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু হনুমান কোনটি যে মৃত সঞ্জীবনী বৃক্ষ তা চিনতে না পেরে সম্পূর্ণ পর্বতই নিজের হাতে তুলে নিয়ে শিবিরের দিকে যাত্রা করলেন। যাত্রার সকল বাধা–বিপত্তি অতিক্রম করে হনুমান তার গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হন। তারপর রাজবৈদ্য সুষেন মৃত সঞ্জীবনী বৃক্ষ থেকে পাতা নিয়ে ঔষধ তৈরি করে লক্ষ্মণকে সেবন করালেন। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্মণের জ্ঞান ফিরে আসে। তখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি হনুমানকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

হিতোপদেশ: ভগবান বা সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে সেবা করলে বা তাঁর নির্দেশ পালন করলে অসম্ভব কার্যও সম্ভব করা যায়।

মূর্তি, ভাস্কর্য ও বিগ্রহ

'ভাস্কর্য' হলো বিভিন্ন জড় উপাদানে তৈরি শিল্পকর্ম। আর 'বিগ্রহ' হলো দেবমূর্তি বা দেহ। আর 'মূর্তি' শব্দের আভিধানিক অর্থ আকৃতি বা রূপ। সে অর্থে বিগ্রহ ও ভাস্কর্য উভয়ই মূর্তি। তবে, ভাস্কর্য ও সাধারণ মূর্তির সঙ্গে বিগ্রহের পার্থক্য রয়েছে। বিগ্রহ অর্থে বিশেষত দেবতার বা ভগবানের মূর্তিকে বোঝায়। সেবিত বা পূজিত বিগ্রহকে বলা হয় অর্চামূর্তি, অর্চাবিগ্রহ বা অর্চাবতার।

ধাতু, কাঠ, মাটি, পাথর ইত্যাদি দিয়ে যে কেউ কল্পনাপ্রসূত অথবা যেকোনো রূপের প্রতিকৃতি তৈরি করতে পারে, সেটা এক প্রকার শিল্পকর্ম বা ভাস্কর্য; আবার কেউ হয়তো তার পূজাও করতে পারে, কিন্তু সেই প্রতিকৃতি কল্পনাপ্রসূত বা শাস্ত্রানুমোদিত না হওয়ায় তা বিগ্রহ আরাধনা নয়। সহজে বলা যায়, সকল বিগ্রহ ও ভাস্কর্যই মূর্তি, কিন্তু সকল মূর্তি বিগ্রহ নয়।

সাধারণ একটি মূর্তি বা ভাস্কর্য জড় পদার্থের মতোই নিষ্প্রাণ। কিন্তু সনাতন শাস্ত্রে যেভাবে ভগবান বা দেবদেবীর প্রতিকৃতি নির্মাণ করে পূজা করার বিধান রয়েছে, তাতে কঠোর শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। তখন তা জড় বস্তু হলেও দিব্যগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে। ঠিক যেমন, আগুনের সংস্পর্শে লোহা আগুনের গুণপ্রাপ্ত হয়, চৌম্বকের সংস্পর্শে লোহা চৌম্বকের গুণপ্রাপ্ত হয়।

সাধারণ তামার তারে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তখন বিদ্যুৎ শক্তি থাকে বলে তা স্পর্শ করলে শক অনুভূত হয়। একটি সাধারণ সিলিকন ও প্লাস্টিকের তৈরি সিমকার্ড যখন মোবাইলে ঢুকানো হয় এবং অপারেটর কোম্পানি সিম কার্ডটি সচল করে দেয়, তৎক্ষণাৎ তা দূর-দূরান্তে কথা বলার শক্তিপ্রাপ্ত হয়। জড় কিছু বস্তুতে যদি এমন অসাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তবে দিব্যগুণসম্পন্ন দেবদেবীগণ বা ভগবানের পক্ষে কি মূর্তিতে অবস্থান করা অসম্ভব?

শুদ্ধ ভক্তের ভক্তিপূর্ণ আহ্বানে ভগবান বা দেবদেবীগণ দৈবশক্তিবলে সেই বিগ্রহে অবস্থান করেন। তখন তা আর সাধারণ কোনো মূর্তি থাকে না, তা হয় অর্চাবিগ্রহ। মূর্তি বা ভাস্কর্য ও অর্চামূর্তি বা অর্চাবিগ্রহের পার্থক্য আমি আলাদা করে বলছি–

সাধারণ মূর্তি ও ভাস্কর্য

- সাধারণ মূর্তি বা ভাস্কর্য হলো ইট, কাঠ, পাথর ইত্যাদি পদার্থ দিয়ে তৈরি যেকোনো প্রতিকৃতি বা শিল্পকর্ম।
- সাধারণ মূর্তি বা ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয় না।
- সাধারণ মূর্তি বা ভাস্কর্যের রূপ কাল্পনিক অথবা ভৌতিক জগতের কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর আদলে গড়া।
- সাধারণ মূর্তি বা ভাস্কর্য কেবলই অচেতন জড় পদার্থ।
- ভাস্কর্যের সাথে পূজা বা আরাধনার কোনো সম্পর্ক নেই। কেবল প্রদর্শনীর জন্য তৈরি করা হয়।

অর্চামূর্তি বা বিগ্রহ

অর্চামূর্তি বা অর্চাবিগ্রহ আট প্রকার উপাদান (ধাতু, কাঠ, পাথর, মাটি, বালি, মন, রত্ন, আলেখ্য চিত্রপট ইত্যাদি) দিয়ে তৈরি ভগবান বা দেবদেবীগণের প্রতিকৃতিকে বিগ্রহ বলা হয়। বিগ্রহে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার মাধ্যমে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

- শ্রীবিগ্রহের রূপ বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে তৈরি করা হয়।
- অর্চামূর্তি বা অর্চাবিগ্রহ জড় রূপে প্রতিভাত হলেও তা চিন্ময় (চেতনাময়)।
- ভক্তের সঙ্গে প্রীতি বিনিময়ের জন্য ভগবান নিজেকে বিগ্রহরূপে প্রকাশ করেন।
- প্রতিদিন অর্থাৎ নিত্য বিভিন্ন উপাচারে পূজার্চনা ও আরাধনা করাই বিগ্রহের উদ্দেশ্য।

প্রবন্ধ

যেমন কর্ম তেমন ফল

বিবর্তনক্রমে জীবাত্মা মানবজন্ম পায়। মানবজন্মেই বিবেক–বুদ্ধি পাওয়া যায়। ভগবান মানুষকে ভালোমন্দ বিচারবোধ দান করে থাকেন। মানুষ তার স্বতন্ত্র ইচ্ছাক্রমে কর্মক্ষেত্রে সদাচার বা কদাচার করতে থাকে। মানুষের সমস্ত কর্মের সাক্ষী চৌদ্দজনের নাম মহাভারতের আদিপর্বে উল্লেখ রয়েছে।

যথা– (১) সূর্য, (২) চন্দ্র, (৩) বায়ু, (৪) অগ্নি, (৫) আকাশ, (৬) পৃথিবী, (৭) জল, (৮) দিবা, (৯) নিশা, (১০) ঊষা, (১১) সন্ধ্যা, (১২) ধর্ম, (১৩) কাল, (১৪) পরমাত্মা।

সারা বিশ্বে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে আমরা অনেক পাপকর্ম করতে পারি, কিন্তু এসকল দেবতাদের কাউকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আবার আমাদের বহু সৎ কর্মের হিসাব এই বিশ্বে কেউ না রাখলেও তারা সাক্ষী থাকেন। এমনকি সমস্ত দেবতাদেরও যদি কখনও সম্ভব হয়ে থাকে, কোনো কিছু তাদের আড়ালে থাকার বা করার মতো, তবুও কাল কিংবা সর্বোপরি পরমাত্মাকে আড়াল করে কোনও কিছু করা সম্ভব নয়।

মানুষের সমস্ত পাপ–পুণ্যের হিসাবরক্ষক হচ্ছেন শ্রীচিত্রগুপ্ত। তিনি শ্রীযমরাজের কর্মসচিব। পাপ তিন প্রকার। যথা–

(১) শারীরিক পাপ : পরহিংসা, চুরি, পরস্ত্রী সঙ্গ।
(২) বাচিক পাপ : অসৎ প্রলাপ, নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ, পরদোষ কীর্তন, মিথ্যা ভাষণ।
(৩) মানসিক পাপ : পরের দ্রব্যে লোভ, পরের অনিষ্ট চিন্তা, বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা।

এই ত্রিবিধ পাপ সযত্নে এড়িয়ে চললে মানুষ ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হতে পারে। শ্রীভীষ্মদেব যুধিষ্ঠির মহারাজকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। (মহাভারত অনুশাসন পর্ব ১৩ অধ্যায়)

পাপাচারী মানুষ যখন স্থূল দেহ ত্যাগ করে তখন যমদূতেরা তার সূক্ষ্ম দেহকে পাশবন্ধ করে যমপুরীতে নিয়ে যায়।

দর্পচূর্ণ

একবার কৃষ্ণ এবং বলরাম গোপদেরকে ইন্দ্রপূজার জন্য একটি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে দেখলেন। কৃষ্ণ নন্দ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “পিতা, এসব কি হচ্ছে?” নন্দ মহারাজ প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন, “প্রিয় পুত্র, আমাদের পরিবার প্রতিবছর এই পূজা করে। বছরব্যাপী পর্যাপ্ত জল সরবরাহ করার কারণে রাজা ইন্দ্রের প্রতি আমাদের ধন্যবাদ প্রদর্শন করতে হয়। ইন্দ্র প্রদত্ত মেঘ জল বর্ষণ করে যা শস্য, সবজি এবং ঘাস উৎপাদন করে।”

কৃষ্ণ তাঁর পিতাকে পূজা থামাতে বললেন এবং ব্যাখ্যা করলেন, “ইন্দ্র কেবল আমাদেরই নয় বরং সকলকে বৃষ্টি দান করে। ইন্দ্রকে পূজা করার কোন প্রয়োজন নেই। এর পরিবর্তে অনুগ্রহ করে বিষ্ণু ভক্তদের এবং গোবর্ধন পর্বতকে পূজা করার জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন।

নন্দ মহারাজের নেতৃত্বে বৃন্দাবনের গোপেরা কৃষ্ণের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিল। তারা ভক্তদের ডাকলেন এবং মন্ত্রোচ্চারণ ও সুস্বাদু আহার্য নিবেদনের মাধ্যমে গোবর্ধন পর্বতের পূজা শুরু করেছিলেন। বৃন্দাবনের সকলে তাদের সজ্জিত গাভী নিয়ে এসেছিল। তারপর গাভীদের সামনে রেখে তারা গোবর্ধন পর্বতকে পরিক্রমা করলেন।

রমণীগণ সুন্দর বস্ত্র পরিধান করেছিলেন এবং গরুর গাড়িতে বসে তারা কৃষ্ণের চমৎকার কার্যাবলীর গুণকীর্তন করছিলেন। ভক্তগণ গোপ এবং তাদের পত্নীদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন। তখন, কৃষ্ণ সমবেত গ্রামবাসীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে সকলের চোখের সামনে একটি প্রকান্ড এবং চমৎকার আকৃতি ধারণ করলেন। তিনি বললেন, “আমিই গোবর্ধন পর্বত,” এবং সেখানে নিবেদিত খাদ্যসামগ্রী আহার করতে শুরু করলেন।

দেবরাজ ইন্দ্রও ভগবানের একজন সেবক, এই ব্রহ্মান্ডের প্রশাসকদের অন্যতম। মাঝে মাঝে সে অহংকারী হয়ে যায় এবং নিজেকে সর্বেসর্বা বলে মনে করে। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে উচিত শিক্ষা প্রদান করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্যই সকল পূজা উদ্দিষ্ট। কৃষ্ণ কেবল ইন্দ্রের প্রভুই নন বরং তিনি ব্রহ্মা, চন্দ্র, বায়ু এবং বরুণ প্রভৃতি সকল দেবতাদেরও প্রভু। যাহোক, অহংকারের কারণে ইন্দ্র তা ভুলে গিয়েছিল।

ইন্দ্র যখন দেখল যে, কৃষ্ণ তাঁর পূজা বন্ধ করেছে তখন সে খুব ক্রোধান্বিত হল। ইন্দ্র সবচেয়ে শক্তিশালী মেঘ ‘সম্বর্তক মেঘ’কে আহ্বান করল এবং বলল, “বৃন্দাবনের উপর যাও এবং পুরো এলাকা ভারী বর্ষণে প্লাবিত কর। আমার বাহন ঐরাবতের উপর চড়ে আমিও যাব এবং ঝড়ের সৃষ্টি করব। বৃন্দাবনবাসীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি সকল শক্তি ব্যবহার করব।”

দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে ভয়ংকর মেঘেরা বৃন্দাবনের উপর গেল এবং তাদের সব শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে জলবর্ষণ করতে শুরু করল। সেখানে নিরন্তর বজ্রপাত, বিজলি, তীব্র বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃন্দাবনের সকল অধিবাসী এবং পশুরা ঠান্ডায় কাঁপছিল। তারা সুরক্ষা এবং আশ্রয়ের জন্য কৃষ্ণের দিকে দৌড়ে গেল।

কৃষ্ণ কেবল স্মিত হাসলেন এবং তাঁর বাম হস্তের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে গোবর্ধন পর্বত ধারণ করলেন। তিনি সকলের দিকে তাকিয়ে স্নেহসহকারে বললেন, "প্রিয় বৃন্দাবনবাসীগণ! তোমরা অনুগ্রহ করে গোবর্ধন পর্বতের নিচে আশ্রয় গ্রহণ কর।" বৃন্দাবনবাসীগণ তাদের গোধনসহ পুরো সপ্তাহ গোবর্ধন পর্বতের নিচে অবস্থান করেছিলেন।

কৃষ্ণের অনন্য শক্তি দেখে, স্বর্গরাজ ইন্দ্র তার কর্মের জন্য লজ্জা অনুভব করল। সে এখন দেখল যে, তার দর্পই কেবল চূর্ণ হয়েছে। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং কৃষ্ণের নিকট এসে বলল, প্রিয় প্রভু আমি এত অহংকারী ছিলাম যে, ভেবেছিলাম আপনি বৃন্দানবাসীদের আমার পূজা থেকে বিরত করছেন। এখন আপনার কৃপায় আমি অনুধাবন করেছি যে, আপনি পরমেশ্বর ভগবান। আমার সকল শক্তি মূলত আপনার থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। সেজন্য, প্রিয় প্রভু অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করুন এবং আশীর্বাদ করুন যেন কখনো এত মূর্খতার সাথে কার্য না করি।

ভক্তিকথা

আরতির তাৎপর্য

সাধারণত আরতি বলতে বোঝায় সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদানসমূহ বিগ্রহরূপী ভগবানকে নিবেদন করা। ভগবদ্গীতায় (৭.৪–৫) বর্ণনা করা হয়েছে, এই জড় জগৎ ভূমি, জল, বায়ু, আগুন, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই আটটি উপাদান দিয়ে তৈরি। এখানে ভূমি দ্বারা সমস্ত কঠিন, জল দ্বারা তরল, বায়ু দ্বারা বায়বীয়, আকাশ দ্বারা শূন্যমাধ্যম ও শব্দতরঙ্গ, অগ্নি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বিকিরণ ও শক্তিকে বোঝায়। আরতির সময় আমরা এই আটটি উপাদানের প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন দ্রব্যাদি ভগবানকে নিবেদন করি।

ফুল এবং বস্ত্র দ্বারা ভূমিকে, জল দ্বারা জলীয় বস্তুকে, প্রদীপ দ্বারা অগ্নিকে, চামর দ্বারা বায়ুকে, শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা আকাশকে, বিভিন্ন মন্ত্র ও কীর্তনের দ্বারা মনকে, আরতিতে পূর্ণরূপে সমর্পণের দ্বারা বুদ্ধিকে, প্রণাম দ্বারা অহংকারকে পূজারী শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে থাকে।

আরতির দ্রব্যসমূহ চক্রাকারে ঘুরানো হয়, কারণ এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, কালের আবর্তে সর্বদা আমাদের সকল কার্যক্রম ভগবানকে কেন্দ্র করে সম্পাদন করা উচিত।

যখন বিভিন্ন দ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করা হয়, তখন ভগবান তা গ্রহণ করেন। পঞ্চরাত্রের এমন একটি পন্থা যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সবকিছুই ভগবানের। আমাদের হাত স্পর্শ করে প্রসাদী পুষ্প আঘ্রাণ করে ও শঙ্খ জল শিরে ধারণ করে প্রসাদ (কৃপা) রূপে আমাদের তা প্রদান করেন। তখন আমরা দীপশিখায় ভগবানের প্রসাদরূপে তা গ্রহণ করি। এর দ্বারা ভগবানের প্রতি আমাদের সমর্পণ বৃদ্ধি পায়।

রাজা ভগীরথ

ব্যর্থতাকে কীভাবে জয় করতে হয় তা শেখানোর জন্য শাস্ত্রে অনেক প্রেরণাদায়ী গল্প রয়েছে। এরূপ একটি গল্প হচ্ছে ভগীরথের গল্প। সূর্যবংশের রাজা মহারাজ সগর তার ১০০তম অশ্বমেধ যজ্ঞ করছিলেন। সেই সময় তার ৬০,০০০ পুত্র যজ্ঞের অশ্বকে অনুসরণ করছিল যা হচ্ছে অন্য রাজ্যসমূহের উপর রাজকীয় শ্রেষ্ঠত্বের একটি নিদর্শন। ইন্দ্র তার পদ হারানোর ভয়ে অশ্বটি চুরি করেছিল। তিনি সেই অশ্বটিকে পাতাললোকে নিয়ে কপিল মুনি আশ্রমে বেধে রেখেছিলেন।

সগরের পুত্রগণ সর্বত্র অশ্বটির সন্ধান করছিল এবং অবশেষে তারা কপিল মুনির আশ্রমে এসেছিল। তাদের ঔদ্ধত্ত্ববশতঃ তারা ভুলবশত মনে করেছিল যে, মহামুনি সেই অশ্বটিকে চুরি করেছেন। সগরের পুত্রগণ কপিল মুনির নিকটে আগুন জ্বালিয়ে তাকে বিরক্ত করেছিল। মহর্ষি কপিল সেখানে বহু বছর ধরে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তিনি যে মুহূর্তে তাঁর চোখ খুললেন, সগরের পুত্রগণ তৎক্ষণাৎ অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে গেল।

বিশ্ব পরিব্রাজক নারদ মুনি সগর রাজার নিকট সেই সংবাদ প্রদান করেন। পুত্রদের অকাল মৃত্যুর সংবাদ শুনে মহারাজ সগর বিমর্ষ হয়ে পড়েন। যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকায় তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। অংশুমান নামে সগরের এক পৌত্র ছিল। অংশুমানের পুত্র হচ্ছে দিলীপ এবং তার পুত্রের নাম হচ্ছে ভগীরথ। শৈশবে ভগীরথ এই ঘটনাটি শুনেছিল। সে জানত যে, তার পূর্বপুরুষদের ভস্ম যেহেতু পাতালে পতিত হয়েছে তাই তারা এখনো জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

মহারাজ সগর চেয়েছিলেন, ভগীরথ একটি সুকঠিন কার্য সম্পন্ন করুক। তিনি ভগীরথকে বলেছিলেন, "তুমি কি কোনো প্রকারে পরম পাবনী গঙ্গা নদীকে দিব্য জগৎ থেকে পৃথিবীতে নিয়ে আসতে পারবে? তারপর তুমি গঙ্গাকে নিয়ে পাতাললোকে যাবে যেন গঙ্গার জলধারা তোমার পূর্বপুরুষদের ভস্মের উপর প্রবাহিত হয়। এভাবেই কেবল তারা মুক্তি লাভ করতে পারবে।" তাই ভগীরথ তরুণ বয়সেই হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। এই মহৎ প্রয়াসে সাফল্য লাভের ব্যাপারে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

প্রথমে তিনি বছরের পর বছর ধরে ভগবান বিষ্ণুর নিকট সহায়তা প্রার্থনা করে গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। অবশেষে, মাতা গঙ্গা তাঁর দেবীস্বরূপে ভগীরথকে দর্শন দেন এবং পৃথিবীতে আসতে সম্মত হন। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটি সমস্যা ছিল। গঙ্গার স্রোত এত বেশি হবে যে স্বর্গ থেকে নামার সময় কেউই তার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। তাই এমন একজন শক্তিশালী ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল যিনি স্বর্গ থেকে প্রবাহিত স্রোতকে কেবল গ্রহণ করে শান্তই করবেন না বরং ধারণও করবেন।

মাতা গঙ্গা তখন শিবের নাম উল্লেখ করলেন। তাই ভগীরথ শিবের ধ্যান করতে শুরু করলেন। মহেশ্বর আশুতোষ শীঘ্রই প্রসন্ন হলেন। তিনি ভগীরথের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং গঙ্গার অবতরণকালে

তাঁর চুলের জটায় সেই স্রোতকে ধারণ করতে সম্মত হলেন! পুণ্যসলিলা গঙ্গা স্বর্গলোক থেকে শিবের জটা পর্যন্ত প্রবাহিত হলেন। কিন্তু গঙ্গার দম্ভ চূর্ণ করার জন্য শিব গঙ্গার প্রবাহকে রোধ করে তার চুলের মধ্যে গঙ্গাকে আটকে দিলেন।

ভগীরথ পুনরায় প্রার্থনা করলেন এবং গঙ্গাকে পৃথিবীতে আসতে দেয়ার জন্য শিবকে অনুরোধ জানালেন। শিবের জটা থেকে পতিত জল স্রোতস্বিণী গঙ্গারূপে প্রবাহিত হতে লাগল। গঙ্গাদেবী ভগীরথকে তার পূর্বপুরুষদের ভস্মের দিকে তাঁকে নিয়ে যেতে বললেন। তাই ভগীরথ তার রথ নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং তাকে অনুসরণ করতে দেবীকে অনুরোধ করলেন। জহ্নু মুনি নামক এক ঋষি গঙ্গার প্রবাহ পথে ধ্যান করছিলেন। গঙ্গা তাঁর আশ্রমকে প্লাবিত করায় তিনি খুব রেগে গিয়েছিলেন। ক্রোধবশতঃ জহ্নু মুনি পুরো নদীকে পান করেছিলেন।

কিন্তু ভগীরথ ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি তার প্রয়াস ত্যাগ করেননি। তিনি পুনরায় ধ্যানে বসলেন। মহর্ষিকে সন্তুষ্ট করতে তার বহু বছর লেগেছিল। অবশেষে মুনি শান্ত হয়ে তাঁর কর্ণ দিয়ে নদীকে বের হতে দিলেন। সেজন্য গঙ্গার নাম হল জাহ্নবী। পরিশেষে গঙ্গা ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নতর লোক পাতালে পৌঁছলেন, যেখানে ভগীরথের পূর্বপুরুষদের ভস্ম পড়ে ছিল। গঙ্গার পবিত্র জল সগর রাজার মৃত পুত্রদের শুদ্ধ করে তৎক্ষণাৎ মুক্তি প্রদান করল।

ভগীরথ প্রতি পদে পদে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছিলেন কিন্তু তিনি সকল প্রতিবন্ধকতাগুলো নিঃস্বার্থভাবে সহ্য করেছিলেন। অবশেষে তিনি গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন এবং তাঁর পূর্ব পুরুষদের মুক্ত করেছিলেন। আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, সুন্দরতম প্রয়াস রাখা এবং সর্বোচ্চ চেষ্টা করাই সফলতার চাবিকাঠি।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়জন। তিনি এই জগতে মহাপ্রভুর বাণী এবং মনোভাব প্রচার করার জন্য আবির্ভূত হন। তিনি ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ২ সেপ্টেম্বর বীরনগরে তাঁর মাতামহের আলয়ে আবির্ভূত হন। তাঁর পিতার নাম শ্রী আনন্দ চন্দ্র দত্ত ও মাতার নাম শ্রী জগন্মোহিনী দেবী। পিতা–মাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন শ্রী কেদারনাথ দত্ত।

শিশুকালে মাত্র দুবছর বয়সে ঠাকুরের জিহ্বায় কবিত্বের স্ফূর্তি হয়। তাঁর ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ ভগবদ্ভক্তির অমৃতময় রসে পূর্ণ। মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের যাবতীয় তথ্য ও ইতিহাস আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি মাত্র নয় বছর বয়সে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি অত্যন্ত মৃদু ও মিষ্টভাষী ছিলেন। প্রীতিপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ বাক্যের দ্বারা তিনি সকলের হৃদয় জয় করেছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অতি পুরাতন স্নেহাস্পদ ছাত্র ছিলেন।

মাত্র এগারো বছর বয়সে ঠাকুরের পিতৃবিয়োগ হয়। তৎকালীন বঙ্গদেশের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী শ্রী কেদারনাথের জননী বারো বছর বয়সের ছেলের সাথে পাঁচ বছরের একজন কন্যার বিবাহ সম্পাদন করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তৎকালীন বৃটিশ সরকারের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের ইচ্ছাক্রমে তিনি কটক সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের এবং ভদ্রক সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ স্বীকার করেছিলেন। সে সময় ঠাকুরের রচিত উড়িষ্যার মঠসমূহের তথ্যপূর্ণ একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যগীতা' নামে একটি গ্রন্থ লিখে তাতে নিজেকে 'সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্ক' রূপে পরিচয় প্রদান করেছেন। শ্রী গৌড়ীয় গোস্বামী সংঘ কর্তৃক ঠাকুর 'ভক্তিবিনোদ' নামে ভূষিত হন।

তখন থেকেই শ্রী কেদারনাথ শ্রী সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মেদিনীপুরে থাকা অবস্থায় তাঁর প্রথম স্ত্রীর অন্তর্ধান হলে মকপুরে তিনি ভগবতী দেবীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

তিনি পুরীতে কিছুকাল ম্যাজিস্ট্রেট রূপে দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে থাকা অবস্থায় ১৮৭৪ সালে তাঁর পুত্র শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আবির্ভূত হন। পুরীতে থাকা অবস্থায় তিনি বিভিন্ন অপশক্তি সম্পন্ন প্রতারকদের শাস্তি দিয়েছিলেন। তিনি যখন পুরী থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি ভারতের বিভিন্নস্থান দর্শন করতে বের হন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহু গ্রন্থ লিখেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে প্রচার করে তিনি শুদ্ধভক্তির বহু প্রতিকূল অপসিদ্ধান্তসমূহ খণ্ডন করেন। তিনি সরকারের শাসন বিভাগের দায়িত্বশীল কার্যে নিযুক্ত থেকেও বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক গ্রন্থ লেখেন এবং প্রচার করেন। ১৮৭৭ হতে ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিভিন্নস্থানে প্রচার করেছেন এবং বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন করেছেন।

একদিন সন্ধ্যার পর নবদ্বীপ শহরে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর গৃহের ছাদে বসে ধামের সৌন্দর্য দর্শন করছিলেন। সেই সময় উত্তর দিকে একটি আলোকময় অট্টালিকা দর্শন করলেন। ঠাকুরের সঙ্গে অবস্থিত

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরও তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। পরদিন সকালে উক্ত স্থানটি বল্লালদীঘি বলে জানা গেল। সেখানকার স্থানীয় প্রবীন ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বললেন, এই স্থানের নাম মিঞাপুর। তখন তিনি পুরাতন নথিপত্র ও ম্যাপ দেখে বুঝতে পারলেন যে এই স্থানই মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান। পরে শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজকে নিয়ে সেই স্থানে গেলে তিনি নিশ্চিত করে বলেন যে, এটিই হচ্ছে মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মায়াপুর।

সরকারি কাজ হতে অবসর গ্রহণ করে তিনি কৃষ্ণনগর হতে গোদ্রুম দ্বীপের সুরভীকুঞ্জে মাসব্যাপী শাস্ত্র আলোচনা করেন। পরে তিনি সেখানে নামহট্ট প্রতিষ্ঠা করে মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শুদ্ধভক্তির সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ মতবাদসমূহ খণ্ডন করে জীবের বাস্তব কল্যাণ বিধান কে করবে, এ চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তখন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর ভৃত্য রূপে এই কার্য সম্পাদন করবেন বলে সংকল্প করেন। ঠাকুর তা শ্রবণ করে তাঁর হৃদয়ের পরম উল্লাস ভাব প্রকাশ করেছিলেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অন্তর্ধান লীলা সম্পাদন করেন।

ইস্‌কন

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) গৌড়ীয়–বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম একটি শাখা। ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইস্‌কন পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার করে চলেছে। শ্রীচৈতন্যদেব জগদ্বাসীকে কৃষ্ণভক্তির বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি কলিযুগের যুগধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের পন্থা প্রচার করেছিলেন:

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।

পৃথিবীব্যাপী সমস্ত নগরাদি গ্রামে ভগবানের এই দিব্যনাম প্রচারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যেই ইস্‌কন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ ইস্‌কন স্থাপন করেছিলেন যাতে সংঘে যোগদানকারী প্রত্যেকেই পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু পেতে পারে। তাই তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে গুরু–পরম্পরা ক্রমে প্রাপ্ত শিক্ষা অনুযায়ী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য রচনা করে গেছেন। তাঁর এই অসামান্য অবদানের জন্য আজ কৃষ্ণভাবনামৃতের সংস্পর্শে এসে অগণিত মানুষ ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে শাশ্বত শান্তির সন্ধান পেয়েছেন।

ইস্‌কন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও বিস্তার

১৯৬৬ সালের ১৩ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের ম্যানহাটনের ২৬ নং সেকেন্ড অ্যাভিনিউতে ছোট একটি দোকান ঘর 'ম্যাচলেস গিফট' এ শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক ইস্‌কন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দাপ্তরিকভাবে এখানে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯২২ সালে এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামীর সাথে তার গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের প্রথম সাক্ষাতে প্রাপ্ত পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করার আদেশই ইস্‌কন প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত এবং পরবর্তী ৪০ বছর ধরে তিনি সেই আজ্ঞা পালনে কাজ করেন।

১৯৫৩ সালে ভারতের ঝাঁসিতে তিনি 'ভক্তসঙ্গ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার ৭টি উদ্দেশ্যই তিনি পরবর্তীতে ইস্‌কনের ৭টি উদ্দেশ্য হিসেবে প্রণয়ন করেন। তারপর ১৯৬৫ সালে আমেরিকা পৌঁছানোর পর দীর্ঘ এক বছর সংগ্রামের পর তিনি ইস্‌কন প্রতিষ্ঠা করেন।

এরপর ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে কানাডা, ইউরোপ, মেক্সিকো, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ভারতে একাধিক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৭০ সালে প্রভুপাদ ইস্‌কন পরিচালনার জন্য 'জি.বি.সি. (গভর্নিং বডি কমিশন)' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৭০ সালে ভারতে ফিরে আসেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে ভারতের বৃন্দাবন, মায়াপুর ও মুম্বাইতে তিনটি বড় মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৭২ সালে প্রভুপাদ কর্তৃক ইস্‌কনের গ্রন্থ প্রকাশনা সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট (বি.বি.টি)' প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বর্তমানে বিশ্বের আধ্যাত্মিক গ্রন্থ প্রকাশের অন্যতম একটি বৃহৎ প্রকাশক সংস্থা।

১৯৭৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক 'ভক্তিবেদান্ত চ্যারিটি ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠিত হয় যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তার পার্ষদবর্গের লীলাভূমি তথা গৌড়মণ্ডল ভূমির উন্নয়ন ও সংস্কারে অর্থসংস্থান করে।

বর্তমানে সারা বিশ্বব্যাপী ইস্‌কনের ৮০০টিরও বেশি মন্দির রয়েছে। এছাড়াও ৭০ এর অধিক গোশালা, খামার ও ইকোভিলেজ আছে।

ইস্‌কনের ৭টি উদ্দেশ্য

১. সুসংবদ্ধভাবে মানবসমাজে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করা এবং সমস্ত মানুষকে পারমার্থিক জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত হতে শিক্ষা দেওয়া, যার ফলে জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভ্রান্তি প্রতিহত হবে এবং জগতে যথার্থ সাম্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

২. শ্রীমদ্ভগবদগীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করা।

৩. সংস্থার সমস্ত সদস্যদের পরস্পরের কাছে টেনে আনা এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে টেনে আনা এবং এইভাবে প্রতিটি সদস্য চিত্তে এমনকি প্রতিটি মানুষের চিত্তে সেই ভাবনার উদয় করানো, যাতে সে উপলব্ধি করতে পারে যে, প্রতিটি জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ।

৪. শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত সমবেতভাবে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার যে সংকীর্তন আন্দোলন, সে সম্বন্ধে সকলকে শিক্ষা দেওয়া ও অনুপ্রাণিত করা।

৫. সংস্থার সদস্যদের জন্য এবং সমস্ত সমাজের জন্য পবিত্র স্থান নির্মাণ করা যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার নিত্যলীলা–বিলাস করবেন এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তা নিবেদিত হবে।

৬. একটি সরল এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক জীবনধারা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সদস্যদের পরস্পরের কাছে টেনে আনা।

৭. পূর্বোল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ সাধন করার জন্য সাময়িক পত্রিকা, গ্রন্থ ও অন্যান্য লেখা প্রকাশ করা ও বিতরণ করা।

বৈদিক শিক্ষা প্রসারে ইস্‌কনের অনবদ্য পদক্ষেপ

ইস্‌কন প্রতিষ্ঠার ৭টি উদ্দেশ্যের মধ্যে ৪টিতেই শিক্ষা শব্দটির সরাসরি উল্লেখ রয়েছে এবং বাকিগুলোও কোন না কোনোভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত । শ্রীল প্রভুপাদের সময় থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ইস্‌কনের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ এবং অর্জন সমূহ দেখে নেওয়া যাক।

গুরুকুল ও স্কুল সমূহের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান

ইস্‌কন পরিচালিত গুরুকুলসমূহে একাডেমিক শিক্ষা ও বৈদিক শিক্ষার সমন্বয় করে পাঠদান করা হয়। এখানে যেমন বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য, কলাবিদ্যা ইত্যাদি নিয়ে শিক্ষাদান করা হয় তেমনি শ্রীমদ্ভগবদগীতা, শ্রীমদ্ভাগতম, রামায়ণ, মহাভারত আদি বৈদিক শিক্ষাও দেওয়া হয়।

১৯৭২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর শ্রীল প্রভুপাদের হাত ধরে ডালাসে ইস্‌কনের প্রথম গুরুকুল স্থাপিত হয়। এরপর টেক্সাস, মায়াপুর, বৃন্দাবনসহ বিভিন্ন বড় বড় শহরে ইস্‌কনের ১৫টিরও অধিক গুরুকুল রয়েছে। গুরুকুলের পাশাপাশি ভক্তিবেদান্ত স্কুল, ভক্তিবেদান্ত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ভক্তিবেদান্ত একাডেমি এরকম বিভিন্ন নামে মায়াপুরসহ ভারতের বিভিন্ন শহরে, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়াসহ বড় বড় দেশে এমনকি বাংলাদেশেও কয়েকটি স্কুল রয়েছে।

ভক্তি কোর্সসমূহ

ভক্তিমূলক কোর্স যেমন– ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিবৈভব, ভক্তিবেদান্ত, ভক্তি সার্বভৌম, স্প্রিচুয়াল সায়েন্টিস্ট, ডিসকভার ইয়োরসেল্ফ, আধ্যাত্মিক রহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, ইস্‌কন শিষ্য প্রশিক্ষণ কোর্স আদি বিভিন্ন কোর্স প্রদান করে থাকে। মায়াপুর ইনস্টিটিউট, ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউট, গোবর্ধন ইনস্টিটিউট ইত্যাদির মাধ্যমে কোর্সগুলি পরিচালিত হয়, যেখান থেকে বৈদিক শিক্ষায় নিজেকে সমৃদ্ধশালী করার সুযোগ রয়েছে।

প্রশিক্ষণ মূলক কোর্স

ইস্‌কন ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, দ্বন্দ্ব নিরসন, পারিবারিক জীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োগ, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট আদি বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। যেমন– Leadership Course, জিবিসি ট্রেনিং, গুরু ট্রেনিং, পূজারী কোর্স, অর্চন কোর্স ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকল্প

ইস্‌কনে ইকোভিলেজ, "Gita Valley" এর মতো কিছু প্রকল্প রয়েছে যেগুলোও শিক্ষা প্রসারণে ভূমিকা রাখছে। যেমন– ভারতের মহারাষ্ট্রে অবস্থিত গোবর্ধন ইকোভিলেজ, যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ায় "গীতানগরী" যেটি বর্তমানে "Gita Valley" নামে পরিচিত, ভারতের মহারাষ্ট্রে "নীলাচল বৈদিক ভিলেজ", আমেরিকার ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় "নিউ বৃন্দাবন", নিউজিল্যান্ডে "নিউ বর্ষাণা", মায়াপুর "বৈদিক ভিলেজ ও খামার" ইত্যাদি অন্যতম।

বই প্রকাশনা ও প্রচার

শ্রীল প্রভুপাদের রচিত ৮০টিরও বেশি গ্রন্থসমূহ, বিভিন্ন আচার্যবৃন্দদের গ্রন্থ ও বৈদিক গ্রন্থসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত করে চলেছে "ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট"। এই গ্রন্থসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচারের মাধ্যমে সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ আধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে।

১৯৬৬ সালের পর ইসকনের মাধ্যমে প্রায় ৬০ কোটিরও বেশি ধর্ম ও নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থ বিতরণ করা হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ইস্‌কনের অর্জনসমূহ

- ২০১৭ সালে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা UNWTO কর্তৃক বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হয় ইস্‌কনের ইকোভিলেজ প্রকল্পকে।
- ২৪ নভেম্বর, ২০১৪ সালে নাইজেরিয়ার লাগোসে খাদ্য বিতরণ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইস্‌কনকে 'সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি অ্যাওয়ার্ডস (SISA) – ২০২৪' এ ভূষিত করে।
- পৃথিবীর প্রায় ৮০টি ভাষায় শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ এর প্রকাশ এবং ১০৮টি ভাষায় এর ভূমিকা অনুবাদ করা হয়।
- 'Sri Mayapur International School' যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

- নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রসারে ইস্‌কনের একটি উদ্যোগ Value Education Olympiad জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) এর সাথে যৌথভাবে পরিচালিত হয়।

আন্তর্জাতিক পরিসরে ইস্‌কনের কার্যক্রম

বর্তমান বিশ্বের প্রায় ১৫০টিরও বেশি দেশে বিস্তৃত ইস্‌কন একটি সুসংগঠিত ধর্মীয় আন্দোলন হলেও এটির কার্যক্রম শুধু ধর্মীয় প্রচারণায় সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা, সংস্কৃতি, পরিবেশ এবং সামাজিক উন্নয়নকে একত্রিত করে একটি সমন্বিত আধ্যাত্মিক–সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলেছে। বিভিন্ন দেশে ইস্‌কনের কার্যক্রম ঐ দেশের আইন, স্থানীয় সংস্কৃতি এবং সামাজিক চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে পরিচালিত হয়, যার কারণে বিশ্বব্যাপী ইস্‌কনের প্রচার এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। চিলি থেকে রাশিয়া, নিউজিল্যান্ড থেকে কানাডা পৃথিবীর কোণে কোণে মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলন জনপ্রিয়ভাবে বিস্তার লাভ করেছে।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ইস্‌কন

নিউইয়র্কের টম্পকিন্স স্কোয়ার পার্কে একটি বৃক্ষের নিচে এক বাঙালি শিক্ষিত সন্ন্যাসীর করতাল বাজিয়ে প্রকাশ্যে সংকীর্তন করার মাধ্যমেই জনসম্মুখে ইস্‌কনের প্রচারের পথচলা শুরু হয়েছিল। তারপর নিউইয়র্ক, সানফ্রান্সিসকো, লস এঞ্জেলসসহ আমেরিকার বড় শহরসহ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রায় ১৫০টির মতো কেন্দ্র রয়েছে ইস্‌কনের, এছাড়াও অনেক ইকোভিলেজ ও কৃষি খামার প্রকল্প, বড় বড় নিরামিষ রেস্তোরাঁ বিদ্যমান।

ইউরোপ মহাদেশে ইস্‌কন

ইউরোপ মহাদেশে ইস্‌কনের ২০০ টিরও অধিক মন্দির ও নামহট্ট কেন্দ্র রয়েছে। ১৯৬৮ সালে প্রভুপাদের তিন শিষ্য দম্পত্তির দ্বারা লন্ডনে প্রথম ইউরোপের প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়। তৎকালীন জনপ্রিয় ব্যান্ড বিটলসের কিংবদন্তী শিল্পী জর্জ হ্যারিসন ইস্‌কনের 'হরেকৃষ্ণ আন্দোলন'–এ মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিজ বাড়িটি দান করেন। যেটি 'ভক্তিবেদান্ত ম্যানর' নামে পরিচিত এবং বর্তমান ইউরোপের অন্যতম প্রধান আধ্যাত্মিক তীর্থস্থান ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। লন্ডনের রথযাত্রা প্রতি বছর 'ট্রাফালগার স্কয়ারে' অনুষ্ঠিত হয় যেখানে লাখ লাখ ব্রিটিশ ও পর্যটকেরা অংশ নেয়।

লন্ডন ছাড়াও জার্মানির বার্লিন, হামবুর্গ, ফ্রান্সের প্যারিসে, ইতালির রোম ও মিলানে, স্পেন, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ডসহ সব দেশেরই বড় বড় শহরে ইস্‌কনের কেন্দ্র রয়েছে যেখানে সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মাণ, রেস্টুরেন্ট, ভক্তিমূলক শিক্ষা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্ট্রিট হরিনাম সংকীর্তন, রথযাত্রা আদি উৎসবের মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম চলছে।

আফ্রিকা মহাদেশে ইস্‌কন

১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় কার্যক্রম শুরুর মাধ্যমে আফ্রিকায় ইস্‌কনের প্রচার শুরু হয়। ডারবানে অবস্থিত 'শ্রীশ্রী রাধা রাধানাথ মন্দির' যেটি 'টেম্পল অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং' নামেও পরিচিত এবং এটি মহাদেশের অন্যতম প্রধান আধ্যাত্মিক ও পর্যটন কেন্দ্র।

দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়াও নাইজেরিয়া, কেনিয়া, মরিশাস, ঘানা, উগান্ডা, তানজানিয়াসহ অন্যান্য দেশে ইস্‌কন তাদের কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্রদের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে বিনামূল্যে সুস্বাদু খাবার বিতরণ করা হয়।

ওশেনিয়ায় ইস্‌কন

এই মহাদেশে ইস্‌কনের কার্যক্রম সুসংগঠিত, আধুনিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে অভিযোজিত। ১৯৭১ সালে শ্রীল প্রভুপাদ অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে যান, সেখানে ছোট একটি কেন্দ্রের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই যাত্রা আজ দেশটির প্রতিটি প্রধান শহরে (যেমন মেলবোর্ন, ব্রিসবেন) বিশাল মন্দির ও কমিউনিটি সেন্টার তৈরির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও নিউজিল্যান্ড ও ফিজির মতো দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে ইস্‌কনের প্রচার কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে।

নিউ সাউথ ওয়েলসের 'নিউ গোবর্ধন ফার্ম' প্রকল্পটি বিশাল অঞ্চল জুড়ে গোশালা ও পরিবেশবান্ধব কৃষিকাজের মাধ্যমে 'Simple Living & High Thinking' আদর্শের বাস্তবায়ন করছে।

এশিয়া মহাদেশে ইস্‌কন

১৯৭০ সালে প্রভুপাদের ভারতে ফিরে আসার মধ্য দিয়েই এশিয়ায় ইস্‌কনের প্রচার শুরু হয়। এশিয়ায় বর্তমানে প্রায় ৪০০ এর মতো কেন্দ্র রয়েছে । এশিয়ার প্রায় সব দেশেই ইস্‌কনের মন্দির বা কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশেই বেশি কেন্দ্র রয়েছে। ভারতের মায়াপুরে অবস্থিত 'মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির' এবং নির্মাণাধীন "টেম্পল অব বৈদিক প্ল্যানেটেরিয়াম" (TOVP) ইস্‌কনের প্রধান আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। এছাড়া মুম্বাইয়ের জুহুর হরেকৃষ্ণল্যান্ডে 'শ্রীশ্রী রাধা রাসবিহারী মন্দির', বৃন্দাবনে 'শ্রীশ্রী কৃষ্ণ বলরাম মন্দির' এবং কলকাতা, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, পুনে, নাসিক, হায়দ্রাবাদসহ বড় বড় সব শহরে দৃষ্টিনন্দন মন্দির রয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ অন্যান্য দেশগুলিতে ইস্‌কনের অনেক কেন্দ্র রয়েছে। চীন, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্য অনেক দেশেই ইস্‌কনের মন্দির ও কেন্দ্র রয়েছে।

বাংলাদেশে ইস্‌কন

প্রতিষ্ঠা ও প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে ইস্‌কনের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৮ সালের দিকে। শ্রীল প্রভুপাদ প্রথম থেকে চাইছিলেন বাংলাদেশে ইস্‌কনের প্রচার হোক। ব্যস্ততার কারণে তিনি নিজে না আসতে পারলেও তাঁর বরিষ্ঠ শিষ্যদের বাংলাদেশে প্রচারের জন্য বিশেষ আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন।

কার্যক্রম

বিশ্বের অন্যান্য দেশের কার্যক্রমের মতো বাংলাদেশেও ইস্‌কনের সকল কার্যক্রম রয়েছে। সুন্দর সুন্দর মন্দির স্থাপনা সেখানে সার্বক্ষণিক ভগবানের সেবা পূজা করা, হরিনাম সংকীর্তন করা ও প্রচার করা, গ্রন্থ অধ্যয়ন, প্রকাশনা ও প্রচার করা, সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদ বিতরণ করা ইস্‌কনের মূল কার্যক্রম। এছাড়াও রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী আদি উৎসব আয়োজন করা। ঢাকার রথযাত্রা বিশ্বে অন্যতম।

এর বাইরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণ ও খাদ্য বিতরণ করা, আর্থিক সহযোগিতা করা, ক্ষতিগ্রস্ত ঘর বাড়ি মেরামত করে দেওয়াসহ বিভিন্ন জনসেবামূলক কার্যক্রমের সাথে ইস্‌কন সম্পৃক্ত রয়েছে। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইস্‌কন পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেগুলিতে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি বৈদিক শিক্ষায় ছাত্র–ছাত্রীদের শিক্ষা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ইনিস্টিটিউটের মাধ্যমে ভক্তিশাস্ত্রী আদি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

বাংলা ভাষা বিশ্বায়নে ইস্‌কনের ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ভাষা গুলির মধ্যে বাংলা ভাষার অবস্থান মাতৃভাষার দিক দিয়ে ৫ম এবং মোট ব্যবহারকারী ভাষার দিক দিয়ে ৭ম বৃহত্তম ভাষা।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মাতৃভাষা বাংলা এবং এছাড়াও ভারতের ত্রিপুরা, আসাম, উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড, মেঘালয়, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর বাংলাভাষী মানুষ বাস করে। ভারতের ২য় ব্যবহারকারী ভাষা বাংলা, সিয়েরা লিওনে অন্যতম সম্মানসূচক সরকারি ভাষা বাংলা। মাতৃভাষায় কথা বলার জন্য একমাত্র বাঙ্গালিদেরই প্রাণ বিসর্জনের ইতিহাস রয়েছে। অসংখ্য কবি সাহিত্যিকদের সুন্দর লেখনীর দ্বারা বাংলা ভাষার সাহিত্য ভান্ডারও অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী।

সেই বাংলা ভাষারই অন্যতম ব্যক্তিত্ব শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬–১৫৩৩খ্রি.) যিনি একাধারে সমাজ সংস্কারক এবং প্রেমধর্মের প্রচারক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়ে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, বৈষম্যে জর্জরিত এই বঙ্গ ভূমিতে বৈষ্ণব দর্শনের দ্বারা সাম্যবাদের বাণী প্রচার করে অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী, প্রেম ও শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেন। তাকে নিয়েই বাংলা সাহিত্যের একটি যুগ ‘চৈতন্যযুগ (১৫০০–১৭০০খ্রিঃ)’ সৃষ্টি হয়েছে। শ্রী লোচনদাস ঠাকুরের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ , মুরারীগুপ্তের কড়চা, বৃন্দাবন দাসের ‘শ্রীচৈতন্য ভাগবত’, নরহরি সরকারের শ্রীভক্তিরত্নাকর এবং নরোত্তম দাস ঠাকুরের রচিত বাংলা গীতাবলী এসবই চৈতন্যদেবেক কেন্দ্র করেই রচিত।

ইস্‌কনের মূল ভিত্তিই হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের দর্শন। এর মধ্যে তিনি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন যা বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষার এক বিপ্লব সৃষ্টি করে। এই গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ

ও শিক্ষা প্রচারিত হচ্ছে। মহাপ্রভুর শিক্ষাকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ এখন বাংলা ভাষা শিখছে। শুধু চৈতন্যচরিতামৃতই নয় শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থসমূহ, নরোত্তম দাস ঠাকুরের রচনাবলী ও অন্যান্য বাংলা গ্রন্থসমূহ প্রভুপাদের সুযোগ্য শিষ্যগণ কর্তৃক জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ানসহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করার ফলে বাংলা ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ ক্রমশ বাড়ছে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ইস্‌কন মন্দিরগুলোতে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার সকল মন্দিরে সকাল সন্ধ্যা বাংলা ভাষায় আরতি কীর্তন গাওয়া হয়। কৃষ্ণাঙ্গ–শ্বেতাঙ্গ সকলেই বাংলা ভাষায় কীর্তন গাইছে, নৃত্য করছে, ভজন শিখছে , গ্রন্থ পাঠ করছে যার ফলে বাংলার ব্যবহার বাড়ছে। ২০১৫ সালে কলকাতার নেতাজি স্টেডিয়ামে ইস্‌কন কর্তৃক বিশ্বের ১০৫ টি দেশের ভক্তবৃন্দদের নিয়ে সমবেতভাবে বৈষ্ণব কবি নরোত্তম দাস ঠাকুরের বাংলায় রচিত গুরুবন্দনা ‘শ্রীগুরুচরণপদ্ম’ পরিবেশন করা হয় যা গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্থান করে নেয়। ইস্‌কনের এই উদ্যোগ বাংলা ভাষা বিশ্বায়নে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

ইস্‌কনের বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম

ইস্‌কন শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় সংগঠন নয়; এটি একটি বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কাযর্ক্রম, যা মানবকল্যাণ, নৈতিকতা এবং সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে। ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইস্‌কন শিক্ষা, খাদ্য সহায়তা, পরিবেশ রক্ষা, নৈতিক উন্নয়ন এবং মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সামাজিক ভূমিকা পালন করে আসছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো – খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি। প্রকল্পটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ উদ্ভিদভিত্তিক বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম হিসেবে পরিচিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুদ্ধের মতো সংকটময় সময়েও এই স্বেচ্ছাসেবী প্রকল্পটি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে; যেমন—কেরালার ভয়াবহ ভূমিধসের সময়, নেপালের ভয়াবহ ভূমিকম্প থেকে শুরু করে বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত বন্যা, রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ ইত্যাদি কঠিন সময়ে স্থানীয় ইস্‌কন ভক্তরা ক্ষতিগ্রস্ত ও উদ্ধারকর্মীদের জন্য দ্রুত গরম ও পুষ্টিকর খাবার পৌঁছে দিয়েছেন।

ইস্‌কনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদ ক্ষুধার্ত শিশুদের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে এই মহৎ উদ্যোগটি শুরু করেছিলেন, যা আজ বিশ্বব্যাপী অসংখ্য মানুষের কাছে আশার আলো হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যে কেউ এই মানবিক প্রচেষ্টায় অনুদান বা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুক্ত হতে পারেন। এটি ইস্‌কনের সবচেয়ে বড় এবং বিশ্ববিখ্যাত সামাজিক প্রকল্প। বিশ্বের প্রায় ৬০টিরও বেশি দেশে এই প্রকল্পটি পরিচালিত হয়। ইস্‌কন পরিচালিত ট্রাইবাল কেয়ার কর্মসূচি মূলত আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য কাজ করে।

মাদকমুক্তি অভিযান

ইস্‌কনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উদ্যোগ হলো মাদকমুক্ত সমাজ গঠন। শ্রীল প্রভুপাদ তরুণদের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে একটি শৃঙ্খলিত জীবনধারা প্রচারে অনুপ্রাণিত করেন। এই কর্মসূচি চারটি মূল নীতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত। যেমন – মাদক ও অ্যালকোহল বর্জন, মাংসাহার পরিহার, অবৈধ যৌনাচার থেকে বিরত থাকা এবং জুয়া পরিত্যাগ।

ইস্কনের সাথে যুক্ত বিশেষ ব্যক্তিবর্গ

বিশ্বজুড়ে শিল্প, সংস্কৃতি এবং ব্যবসার জগতের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ইস্কনের দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং এর প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

জর্জ হ্যারিসন: জর্জ হ্যারিসন ইস্কনের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ১৯৭৩ সালে লন্ডনের নিকটে তাঁর নিজ বাড়িটি দান করেন, যা পরবর্তীতে "ভক্তিবেদান্ত ম্যানর" হিসেবে পরিচিতি পায়। "My Sweet Lord" তার বিখ্যাত গান যা কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে এবং তিনি শ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশে অর্থ সহায়তা করতেন। জর্জ হ্যারিসন ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলমান সময়ে সহায়তা করতে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' আয়োজন করেন এবং তা থেকে সংগ্রহীত অর্থ বাংলার শরণার্থীদের সহায়তায় প্রদান করেন।

আলফ্রেড ফোর্ড: আলফ্রেড ফোর্ড হলেন ফোর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ডের প্রপৌত্র। তিনি ১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে তার নাম হয় অম্বরীশ দাস। তিনি হাওয়াইতে মন্দির নির্মাণে সহযোগিতা করেন। তিনি বর্তমানে মায়াপুরে বৈদিক প্ল্যানেটেরিয়াম (TOVP) নির্মাণের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

স্টিভ জবস (অ্যাপল এর প্রতিষ্ঠাতা): স্টিভ জবস তাঁর ছাত্র জীবনে পোর্টল্যান্ড থাকাকালীন সময়ে খাবারের জন্য নিয়মিত স্থানীয় ইস্কন মন্দিরে যেতেন। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভগবদগীতার দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

বিশিষ্টজনের দৃষ্টিতে ইস্কন

শ্রীল প্রভুপাদ যে গৃহ নির্মাণ করেছেন সেখানে সারা পৃথিবীর মানুষ আশ্রয় পেতে পারে"।

–ড.এম.এন ব্যাশাম

"শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এক অমূল্য কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। মানব–সমাজের মুক্তির জন্য তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো এক অনবদ্য অবদান।"

–শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

"আমি শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি সারা বিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃত ও মানবতার বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। ইস্কন আজ বিশ্বজুড়ে সেবা, খাদ্য বিতরণ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় বড় ভূমিকা রাখছে।"

–প্রণব মুখার্জি, সাবেক রাষ্ট্রপতি, ভারত

“আমি প্রভুপাদের বিনয়, নম্রতা ও সরলতা খুব পছন্দ করতাম। তাঁর অর্জন ও সাহিত্যকর্ম সত্যিই বিস্ময়কর ও বিশাল। তিনি অল্প বিশ্রাম নিয়ে অসাধারণ পরিশ্রম করতেন, যা আমাকে মুগ্ধ করেছে। কৃষ্ণভাবনামৃত বিশ্বজুড়ে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে।”

–**জর্জ হ্যারিসন,** কিংবদন্তী বিটলস সংগীতশিল্পী

“শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা আমার জীবন বদলে দিয়েছে। আমি ইস্‌কনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝেছি। প্রভুপাদের শিক্ষা আমাকে ভক্তি ও সেবার পথে এনেছে। কৃষ্ণভাবনামৃত মানুষের জীবনকে সুন্দরভাবে পরিবর্তন করতে পারে।”

–**আলফ্রেড ফোর্ড,** হেনরি ফোর্ডের প্রপৌত্র, ফোর্ড মোটর কোম্পানির অন্যতম বোর্ড পরিচালক

“হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র মানুষের চেতনাকে উচ্চ স্তরে উন্নীত করে। আমি মহামন্ত্রের আধ্যাত্মিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। ইস্‌কনের কীর্তন পশ্চিমা বিশ্বেও গভীর প্রভাব ফেলেছে। ভক্তিমূলক সঙ্গীত মানুষের অন্তরে পরিবর্তন আনে।”

–**অ্যালেন গিনসবার্গ,** বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী মার্কিন কবি,
লেখক এবং ‘প্রতি–সংস্কৃতি’ আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব

“হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের সংগীত ও আধ্যাত্মিকতা আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। আমি ইস্‌কনের কীর্তন ও ভক্তিমূলক সংস্কৃতি পছন্দ করি। এই আন্দোলন মানুষের মনে আনন্দ ও শান্তি আনে। আধ্যাত্মিক সংগীত মানুষের হৃদয়কে বদলে দিতে পারে।”

–**বয় জর্জ (Boy George),** বিখ্যাত পপ গায়ক

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার বার্তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন।”

–**পণ্ডিত রবি শঙ্কর,** বিখ্যাত সংগীতশিল্পী

জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

জাগ্রত ছাত্র সমাজ

লক্ষ্য: (Our Vision)

» শিক্ষার্থীদের পারমার্থিক জীবন প্রণালী প্রদানের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা। (Protection)
» পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা। (Art of Parenting)
» সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে আদর্শ সমাজ গঠনে ভূমিকা পালন করা। (Social Structure)
» যথাযথ জ্ঞান প্রদান করার মাধ্যমে সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করা। (Social Service)
» পারমার্থিক চেতনাসম্পন্ন নেতৃত্ব প্রদানকারী যোগ্য মানুষ তৈরি করা। (Spiritual Leadership)

উদ্দেশ্য: (Our Mission)

» শিক্ষার্থীদের গীতার জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত করানো। (Spiritual Knowledge)
» সনাতন ধর্ম, বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে মানব জীবন সার্থক করা। (Religion & Vedic Culture)
» মূল্যবোধ সম্পন্ন চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিশুদের তৈরি করে তোলা। (Honest Personality)
» পারস্পরিক সহযোগিতা ও সু-সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্ব-চেতনা বোধ ও আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলা। (Mutual Relationship)
» শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরেকৃষ্ণ আন্দোলন প্রচার ও প্রসারকে সুগঠিত করা। (Spreading Hare Krishna Movement of Lord Caitanya)
» ভগবৎ কেন্দ্রিক আদর্শ জীবন প্রণালী অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা। (Spritual Life-style)
» দিব্য আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা। (Chaitanya Brotherhood)
» প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের যোগ্যতা অর্জনের জন্য গড়ে তোলা। (Preaching)

কার্যক্রম: (Our Activities)

» কোর্স-সিলেবাস ভিত্তিক পাঠদান ব্যবস্থা (Course Based Academic System)
» ব্যবহারিক বিষয়ে (সদাচার) শিক্ষাদান (Practical)
» সংগীত, চিত্রাংকন ও বাদ্যযন্ত্র প্রশিক্ষণ (Music, Art & Entertainments Training)
» উত্তিষ্ঠত জাগ্রত ছাত্র ও অভিভাবক সম্মেলন (Uttisthata Jagrata Students & Parents Council)
» ভক্তিবেদান্ত মেগা কনটেস্ট (Bhaktivedanta Mega Contest)
» বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (Annual Cultural Competition)
» ভক্তিবেদান্ত স্কলারশীপ (Bhaktivedanta Scholarship)
» অভিভাবক কাউন্সেলিং (Parents Counseling)
» শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (Teachers Training Course)
» পারমার্থিক শিক্ষা সফর (Spiritual Study Tour)
» গ্রন্থ প্রকাশনা ও বিতরণ (Book Printing & Distribution)